গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা

গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা

গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

(দ্বিতীয় সংস্করণ--সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৬

মূল্য—২॥০

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৮

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫৬

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1846B—May, 1956—A.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর গত হইল গিরিশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। দেশের চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই তাহা দেখিতে পাইতেছেন, এবং তজ্জন্য কেহ কেহ দুঃখপ্রকাশও করিয়া থাকেন।

কিন্তু আরও দুঃখের কথা আছে। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে, রসরাজ অমৃতলাল তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনার অতুল প্রতিভা ও প্রকৃতিসিদ্ধ আত্মশক্তি এবং আমার সযত্ন সেবা বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অবজ্ঞার পদাসন হইতে যে গৌরবের সিংহাসনে তুলিয়াছিল, সে সিংহাসন টলমল করিতেছে।"—সেই 'গৌরবের সিংহাসন' আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কেন যে আবার 'অবজ্ঞার পদাসনে' বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এ কথা বুঝিতে হইলে গিরিশেরই 'অতুল প্রতিভা ও প্রকৃতিসিদ্ধ আত্মশক্তি'র স্বরূপ জানা আগে আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান নাট্যকলা ও নাট্যসাহিত্যের দুরবস্থা দেখিয়া যাঁহারা দুঃখিত, তাঁহাদের প্রায় কাহারও নিকট হইতে গিরিশের বা গিরিশ-আমলের কোনওরূপ আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্রের চির-প্রস্থানের কিছু পরে অধ্যাপক-শ্রেষ্ঠ সুসাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "গিরিশচন্দ্রকে বঙ্গের গ্যারিক বলা হয়। ইহাতে অনুপ্রাস বেশ জমে বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে তাঁহাকে খাটো করা হয়। গ্যারিক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন বটে, কিন্তু নাটককার-হিসাবে তিনি নিতান্ত নগণ্য। পক্ষান্তরে গিরিশচন্দ্র নটলীলা ও নাটক-প্রণয়নে সমান কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব যদি গিরিশচন্দ্রকে কোন ইংরাজের সহিত তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে সেক্স্‌পীয়ারের সঙ্গেই তুলনা করা সঙ্গত। উভয়েই একাধারে নট ও নাট্যকার ছিলেন। নটলীলায় গিরিশচন্দ্র সেক্স্‌পীয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" কিন্তু স্বর্গগত অধ্যাপক মহাশয়ের এই উক্তি এখনও অনেকের নিকট অত্যুক্তির উচ্ছ্বাস-রূপে পরিগণিত। সেক্স্‌পীয়রকে বর্জন করিয়া ইংরাজী

সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসা যেমন হাস্যকর ব্যাপার, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া বঙ্গসাহিত্যের কথা বলিতে যাওয়াও তেমনই হাস্যকর বিড়ম্বনা ; অথচ আমাদের দেশের সাহিত্যালোচনায় এইরূপ বিড়ম্বনাই সচরাচর ঘটিতে দেখা যায়। ইহা লজ্জার ও দুঃখের কথা নহে কি?

তবে দুঃখের মধ্যেও সুখের বিষয় এই যে, গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজ বরাবর কতকটা উপেক্ষার চক্ষে দেখিলেও সেই উপেক্ষার প্রতি উপেক্ষা-প্রদর্শনপূর্ব্বক স্যর আশুতোষই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. ও এম.এ. ক্লাসে গিরিশ-নাটকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। তৎপরে তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পনায় এই Girishchandra Ghosh Lecturer-পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে গিরিশ-প্রতিভার গৌরব যে দেশবাসী ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করা যায়। গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি, গতি ও প্রকৃতি বুঝাইয়া বলা আবশ্যক-বোধে আমার বক্তৃতায় তাহারই চেষ্টা করিয়াছি।

গিরিশচন্দ্র আমার কাছে শুধু মহাকবি নহেন—তাঁহাকে আমার সাহিত্য-গুরু ভাবিয়া নিজেকে আমি চিরদিনই ধন্য মনে করি। এই বক্তার পদে নিয়োগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে আমাকে তাঁহার কথা বলিবার সুযোগ দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

প্রথম বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই বিদ্বজ্জন-সভায় গিরিশচন্দ্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার পাইয়া আমি গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। তবে এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মনে আশঙ্কার উদয়ও যে কিছু না হইয়াছে, এমন নহে। তাঁহার কৃতিত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে অনেক কথা আমাকে বলিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তবু মনে হয়, এখনও এত কথা বলিবার আছে, যাহার শতাংশের একাংশও বলিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। এক্ষণে সেই সকল কথা অল্প সময়ের মধ্যে অল্প কথায় বেশ গুছাইয়া ও বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না, ইহাই ভাবিয়া ভীত হইতেছি।

গিরিশচন্দ্রের রচনা সুবিশাল সমুদ্র-সদৃশ। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই।"—এ কথা বঙ্কিমবাবু যখন লিখিয়াছিলেন, তখন অবশ্য উহা সত্যই ছিল। শুনিতে পাই, ঈশ্বর গুপ্ত পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে রাজকৃষ্ণ রায়ও বহু পদ্য-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও রচিত প্রচুর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই কবির কবিতাসমূহের ছত্র-সংখ্যা না জানিয়া, আমাদের দেশে সব চেয়ে বেশী কবিতা কে লিখিয়াছেন, তাহা এখন নিঃসংশয়ে বলা সুকঠিন। গিরিশচন্দ্রকে আমরা অনেকেই 'মহাকবি' বলিয়া থাকি, কিন্তু সে কথা তাঁহার কবিতার জন্য বলি না। কবিতা তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সংখ্যা-হিসাবেও বেশী নহে। তবে তাঁহার লিখিত যত কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ আছে, সে সমস্ত রচনা একত্র করিলে, তাহার আকার বোধ হয় রামায়ণের চেয়ে বড় হয়; এবং সেই সব রচনার ভিতর উপাদেয় ও উপভোগ্য সামগ্রী এমন অনেক আছে, যাহা নূতনত্বেরও নিদর্শন-হিসাবে পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ নাই—প্রয়োজনও নাই। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্যই আমাদের আলোচনার বিষয়। কিন্তু ইহার আকার আবার

আরও বিরাট্। গণনা করিলে, তাঁহার নাট্য-গ্রন্থের সংখ্যা আশীতে গিয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন ধরণের এত বেশী নাট্য-গ্রন্থ এ দেশে অদ্যাবধি আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তাঁহারই আসন সকলের উচ্চে বটে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট নাট্য-সাহিত্যই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি। এই অসামান্য কীর্ত্তির জন্যই কেহ তাঁহাকে 'মহা-কবি,' কেহ 'নাট্য-সম্রাট্,' এবং কেহ-বা 'বাঙ্গালার সেক্সপীয়র' আখ্যা দিয়া থাকেন।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, তাঁহার এই সুবিশাল নাট্য-সাহিত্যের সমস্ত ভাব ও কল্পনা, যাবতীয় চরিত্র এবং সৃষ্টি-কৌশল,—সমুদয়ই যে আমি সম্যগ্-রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, এমন অহঙ্কার আমার নাই; এবং এ কথাও কখন মনে করি না যে, গিরিশচন্দ্র যাহা-কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই নির্দ্দোষ ও চমৎকার—সে সমস্তই 'অমরত্বের তরণী'তে স্থান পাইবার যোগ্য।

কিন্তু কেবল গিরিশচন্দ্র কেন, জগতে এমন ভাগ্যবান্ কবি বোধ করি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার সমস্ত রচনা বা কোনও একখানি কাব্য-গ্রন্থকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কালিদাসের অমন যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক—যাহার সৌন্দর্য্য-কথা কত কাল হইতে কত লোকে কত ভাবে বলিয়াও আজ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারিল না—সেই অমর নাটকও নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। ইহার আখ্যান-বস্তু-সংগঠনে কালিদাসের কিরূপ অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রদর্শন-উদ্দেশ্যে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন,—"দুর্ব্বাসার অভিশাপটি পড়িলে সন্দেহ থাকে না যে, শকুন্তলা পাপ-কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিশাপ দেন নাই। দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহাকে—দুর্ব্বাসা-সম মুনিকে—অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দুর্ব্বাসার ক্রোধ—পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্য ক্রোধ।…কালিদাস দুর্ব্বাসাকে হত্যা করুন, তাহাতে তত যায় আসে না। কিন্তু তাঁহার অভিশাপ-সৃষ্টি অত্যন্ত অনিপুণ হইয়াছে।… তাহার পরে শকুন্তলার সখীর অনুরোধে এই অভিশাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন—'অভিজ্ঞান দেখাইলে স্মৃতিভ্রম ঘুচিবে'—ইহা ছেলেমানুষীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সহিত সঙ্গতি-রক্ষার জন্যই এবং অন্তিমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন ঘটাইবার জন্যই যেন ইহা কল্পিত হইয়াছে; নহিলে কোথাও কিছু নাই, 'অভিজ্ঞানের' কথা আসে কোথা হইতে?… যেন দুর্ব্বাসাই নাটকখানির রচনা করিতেছেন, এবং নাটকখানিকে বাঁচাইবার জন্য পথ রাখিয়া যাইতেছেন। তাহার পরে, স্নানকালে অঙ্গুরীয় শকুন্তলার

অঙ্গুলি-ভ্রষ্ট হওয়া, তাহা রোহিত মৎস্যের উদরস্থ হওয়া, এবং ঠিক সেই মৎস্য ধীবর-কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া—এ সমস্ত ব্যাপার তৃতীয় শ্রেণীর নাটককারের উপযুক্ত কৌশল বলিয়া বোধ হয়।"*—দ্বিজেন্দ্রলালের এই কঠোর মন্তব্যের ভিতর কতটা যুক্তিহীন ও কতটা যুক্তিপূর্ণ উক্তি আছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার এখানে প্রয়োজন দেখি না। তবে তাঁহার এই অভিমতের সহিত যাঁহাদের ষোল আনা সহানুভূতি আছে, প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদিগকে ইহাই বলিয়া রাখিতে চাই যে, গল্প জিনিষটাকে নাটকের রূপ দিতে গিয়া কেবল কালিদাস নহেন,—সেক্সপীয়রও অনেক সময় অনেক অঘটনীয় ব্যাপারের অযথা আশ্রয় লইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা একখানি পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক আর্য্য-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিশাপ, বর-প্রদান ও কর্ম্মফল-অনুযায়ী জন্মগ্রহণ—এই তিনটি ব্যাপার সে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গকে যেন সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং এই সব বিষয়কে পরিহার করিয়া পুরাণঘটিত কিছু লিখিতে গেলে, তাহা স্বভাব-সঙ্গত বা বিশ্ব-সাহিত্য হইবে কি না, বলিতে পারি না,—তবে তাহা যে পৌরাণিক-প্রাণশূন্য একটা দেশ-ছাড়া সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

যাহা হউক, আমাদের কথা এই যে, কালিদাসের 'অভিশাপ-সৃষ্টি' যদি-বা 'অত্যন্ত অনিপুণ' হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেক্সপীয়রের ভূত-সৃষ্টি ও ডাকিনীগণের সৃষ্টিকে আরও বেশী অনিপুণ বলিতে হইবে। 'হাম্‌লেট' নাটক, যাহা অনেকের মতে সেক্সপীয়র-প্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান—সেই ইতিবৃত্তমূলক নাটকের প্রথমাঙ্কে দেখিতে পাই, শুধু যুবরাজ হাম্‌লেট একা নহেন, সেই সঙ্গে তাঁহার সহচর-অনুচরেরাও মৃত রাজার প্রেত-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, এবং সেই প্রেত-মূর্ত্তির সহিত হাম্‌লেট রীতিমত বাক্যালাপও করিতেছেন। অথচ রহস্য এই যে, সেই প্রেত-মূর্ত্তিকে হাম্‌লেট যখন আবার তাঁহার মাতার সমীপে বসিয়া দেখিতেছেন, তখন সে প্রেত-মূর্ত্তি কিন্তু তাঁহার জননীর নয়ন-গোচর হইতেছে না। ইহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, গল্পটিকে বাঁচাইবার জন্যই যেন সেক্সপীয়র এই ফরমায়েসী ভৌতিক কৌশলের অবতারণা করিয়াছেন। তারপর, উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক-অবলম্বনেও দুই-একটা কথা এখানে বলিতে চাই। ম্যাক্‌বেথও একখানি অতি প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তমূলক নাটক। এই নাটকে আছে, ম্যাক্‌বেথকে পাপ-পথের

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-রচিত "কালিদাস ও ভবভূতি," সাহিত্য, ১৩১৮।

শেষ-সীমায় লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে ডাকিনীরা একটি পর্ব্বত-গুহার মধ্যে কুহকের কটাহ বেষ্টন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে, এমন সময়ে ম্যাক্‌বেথ তথায় তাঁহার ভাবী ভাগ্য জানিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কটাহ হইতে একের পর এক করিয়া তিনটি মূর্ত্তি উঠিল। প্রথম মূর্ত্তি বলিল,—
"সাবধান! সাবধান! সাবধান!—ম্যাক্‌ডফ।"

তারপর দ্বিতীয় মূর্ত্তির উক্তি—

"কর হত্যা, রহ সদা অটল অভয়,
নারী-পুত্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়।"

ইহার পর তৃতীয় মূর্ত্তি কহিল,—

"ডন্‌সিনান শিখরেতে বার্নাম কানন
না উঠিলে, তব নাহি হইবে পতন।"

—এই সব ভবিষ্যদ্বাণী ম্যাক্‌বেথের মানস-পরিচালনে যতই সাহায্য করুক, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান-হিসাবে উক্ত দৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল। এরূপ ঘটনার বিকটতা রূপ-কথা বা আরব্যোপন্যাসমূলক গীতিনাট্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু ম্যাক্‌বেথের মতন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবন-কথায় উহার অতটা প্রতিপত্তি কেমন যেন 'বেখাপ' বা 'বেমানান' বলিয়াই বোধ হয়। মনে হয়, ডাকিনীরাই যেন নাটকখানির রচনা করিতেছেন। বিশেষতঃ, ডাকিনীদের কুহক-কটাহ হইতে উত্থিত মূর্ত্তিত্রয়ের ভবিষ্যদ্বাক্যসমূহকে সফল করিবার জন্য কবি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও অসুন্দর হইয়াছে। বৃক্ষ-শাখা-হস্তে শত্রু-সৈন্যের আগমনকে ম্যাক্‌বেথের দূতের পক্ষে বার্নাম কানন চলিয়া আসিতেছে মনে করা, এবং ম্যাক্‌বেথের নারী-পুত্র হইতে কোনও ভয় নাই—ইহার উত্তর-স্বরূপ ম্যাক্‌ডফের এই উক্তি—

"হ রে নিরাশ্বাস, যাদু না ফলিবে আর!
করেছিস এত দিন যার সেবা তুই,
কহিবে সে দেবতা তোরে,—
অসময়ে ম্যাক্‌ডফ
বহিষ্কৃত জননী-জঠর হ'তে—
ভিষকের অস্ত্রের প্রভাবে।"

সেক্সপীয়র-কল্পিত এই দুইটি ঘটনাই শকুন্তলার আংটি হারাইয়া যাওয়া, তাহা মৎস্যের উদরস্থ হওয়া এবং সেই মৎস্য জেলের জালে পড়া প্রভৃতি ঘটনার

কল্পনা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ম্যাক্‌ডফ চিকিৎসকের অস্ত্র-সাহায্যে প্রসূত হইলেও নারীই তাঁহাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। সুতরাং ডাকিনীদের বাক্য দ্ব্যর্থক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ম্যাক্‌ডফের যুক্তি-হিসাবে তাহা সার্থক হইয়াছে, বলা যায় না।

তাই বলিতেছিলাম, প্রতিভা যতই কেন প্রবল হউক না, তাহার কার্য্যে দোষ নাই, এ কথা বলা মূঢ়তামাত্র। গিরিশের নাটকেও দোষ আছে, তবে গুণের তুলনায় তাহা নগণ্য মনে করি। বলিতে কি, অভিজ্ঞান শকুন্তলার দুর্ব্বাসার পাশে যদি গিরিশের 'পাণ্ডবগৌরবে'র অনুতাপ-তাপে দগ্ধ দুর্ব্বাসাকে রাখিয়া, এবং ম্যাক্‌ডফের উপরি-উক্ত উক্তির পাশে যদি গিরিশ-রচিত 'প্রহলাদ-চরিত্রে'র নৃসিংহদেবের বাক্যকে উদ্ধার করিয়া ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে, নাটকীয় গুণপণার জন্য গিরিশের গলদেশেই জয়মাল্য প্রদান করিতে হয়। 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকের আখ্যান-বস্তু গিরিশচন্দ্র যে গ্রন্থ* হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে,—

"উর্ব্বশীকে যখন দুর্ব্বাসা শাপ দিল।
ইন্দ্রালয়ে বসিয়া নারদ শুনেছিল॥
অশ্বরূপে পৃথিবীতে আছয়ে উর্ব্বশী।
দণ্ডী নৃপতির গৃহে জানিলেন ঋষি॥
যোগবলে কিছু তাঁর নহে অগোচর।
ভাবিয়া করিলা সাধ মনের ভিতর॥

* * *

কোন শক্তি ধরে দণ্ডী হয় কোন বলী।
স্বর্গের নর্ত্তকী লয়ে মর্ত্ত্যে করে কেলি॥
কহিব এ সব কথা কৃষ্ণ-বিদ্যমান।
তুরঙ্গিণী লবে কৃষ্ণ করি অপমান॥"†

---

* উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য-প্রণীত "দণ্ডীপর্ব্ব"।

† এই দণ্ডী রাজার গল্প রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং" নামক গ্রন্থেরও একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কিন্তু নারদের নাম-গন্ধও নাই। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়।

কিন্তু 'পাণ্ডবগৌরবে'র প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেখিতে পাই, দুর্ব্বাসা দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন,—

"শুন হে দেবর্ষি, কব অধিক কি আর,
ক্রোধমাত্র লভিয়াছি তপস্যার ফলে।
কেন মোরে নিজ-অংশে সৃজিল শঙ্কর,
চিরদিন বহিতে এ অনুতাপানল!
ক্রোধে যারে-তারে দিই অভিশাপ,
অনুতাপে দহে শেষে প্রাণ!
হের, মহাভাগ, ত্যজি যোগ-যাগ,
এসেছি কণ্টকময় কানন-মাঝারে—
উর্ব্বশীর জোগাতে আহার।"

দুর্ব্বাসার মুখে এরূপ অনুতাপের কথা আর কোনও কাব্য বা নাটকে পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। অন্য কবিদের দুর্ব্বাসাকে দেখিলে মনে হয়, কেবল ক্রোধের উপাদানেই যেন তিনি গঠিত, এবং অভিশাপ-প্রদানই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ। কিন্তু গিরিশচন্দ্র 'দুর্ব্বাসাকে হত্যা' করিয়াছেন, এ কথা তাঁহার কেবল 'পাণ্ডবগৌরব' কেন, তাঁহার 'লক্ষ্মণ-বর্জনে'র দুর্ব্বাসাকে দেখিলেও কেহ বলিতে পারিবেন না। এই উভয় গ্রন্থের দুর্ব্বাসাই প্রাণময় জীবন্ত পুরুষ। বিশেষতঃ, 'পাণ্ডবগৌরবে'র প্রারম্ভে যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়া গিরিশচন্দ্র দুর্ব্বাসা-চরিত্রের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা সংস্থান-নৈপুণ্যের সত্যই এক অপূর্ব্ব পরিচয়। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের 'মুখ-সন্ধি'-হিসাবেও* উহা চমৎকার হইয়াছে।

আর তাঁহার 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপুর সংহার-সাধন-সময়ে নৃসিংহ অবতার যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল অবশ্য পুরাণে আছে। কিন্তু পুরাণের কথা তিনি নাটকে যে ভাবে চড়াইয়াছেন, তাহাও নাট্য-নিপুণতার নিদর্শন-রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বর দিয়াছিলেন যে, তৎকাল-পরিচিত জীবজন্তুর তিনি অবধ্য, শস্ত্রাদির দ্বারা তিনি অচ্ছেদ্য এবং জলে, স্থলে, শূন্যে, দিবসে বা রাত্রিকালে তাঁহার মৃত্যু নাই। নাটকের

* "যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

শেষ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, স্ফাটিক স্তম্ভ হইতে নরসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব-দর্শনে হিরণ্যকশিপু যখন বলিলেন,—

"বুঝি বৃথা হয় বর,—
চরাচরে হেন মূর্ত্তি নাই!
তবু বীর-কার্য্য না ভুলিব।—(গদাঘাত)
দিবা রাত্র জলে স্থলে মৃত্যু নাহি মোর,
আরে রে পামর,
কি করিবি নরসিংহ-রূপ ধরি?"

তখন নৃসিংহদেব বলিলেন,—

"সন্ধ্যাকাল, নহে দিবা নিশি,
নহে জলে স্থলে—জানু'পরে ত্যজ প্রাণ;
বল নাহি প্রেম-সম।"

এই দৃশ্যের পার্শ্বে ম্যাক্‌বেথ-বধ-দৃশ্য দাঁড় করাইলে প্রথমটিকে sublime ও দ্বিতীয়টিকে ridiculous বলিতে ইচ্ছা হয় না কি? 'বল নাহি প্রেম-সম' কথাটি অনেকের নিকট হয়ত এ ক্ষেত্রে নিরর্থক বলিয়া মনে হইবে; অনেকে হয়ত ইহাতে 'স্কুল-মাষ্টারি'র গন্ধ পাইবেন। কিন্তু নাটকের সর্ব্বপ্রথম দৃশ্যে হিরণ্যকশিপুর এই উক্তি—

"শুন মন্ত্রী,
সাবধানে হেন প্রথা করহ স্থাপন,
যাহে রাজ্যে হয় ধর্ম্মের হিংসন,
যজ্ঞ ব্রত নাহি হয় অধিকারে;
হরি ভ্রাতৃ-অরি, প্রতিশোধ দেব ত্বরা।"

মনে রাখিয়া যাঁহারা নৃসিংহদেবের 'বল নাহি প্রেম-সম' কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা উহার সার্থকতা ও সুসঙ্গতি বুঝিয়া আনন্দিতই হইবেন। 'ধর্ম্মের হিংসা' যে নাটকের বীজ, সে নাটকের 'নির্বহণ-সন্ধি'তে* 'বল নাহি প্রেম-সম' কথাটা না থাকিলে শুধু ধর্ম্ম ও নীতি নহে, নাটকীয়

---

* "বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ॥"

কলা-কৌশলেরও অপচয় ঘটিত। ধর্ম্ম ও সুনীতি সত্যের প্রাণ। সত্যকে উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

গিরিশ-সম্বন্ধে আরও গৌরবের কথা এই যে, আমাদের জন্য যে নাট্য-সম্পদ্ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ঘটনা-সংস্থান ও ঘটনা-বৈচিত্র্যের গুণে গরীয়ান্ নহে,—আখ্যান-বস্তুর বিষয়-বৈচিত্র্য হিসাবেও তাহা তুলনা-রহিত বলিয়া মনে করি।

১৩০২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'কবি-সঙ্গীত' নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে আছে,—"কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্য-নীতির ব্যভিচার এবং সর্ব্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়।"—এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, গিরিশের নাট্য-সাহিত্যই এই সময়ে এ দেশের প্রায় সকল থিয়েটারেরই প্রধান অবলম্বন ছিল, এবং গণিয়া দেখিলে তাঁহার রচিত নাট্য-গ্রন্থের সংখ্যাও তখন পঞ্চাশকে অতিক্রম করিয়াছে দেখা যায়। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, রবীন্দ্র-নাথের ঐ মন্তব্যকে এখনও যাঁহারা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধবৎ মনে করেন, তাঁহারা খুব সম্ভব আমার এই প্রবন্ধের প্রতি পত্রে অত্যুক্তির উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের মুখ তাকাইয়া বলিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্য-গ্রন্থসমূহে ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্য এবং সত্য ও সাহিত্য-নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যত বেশী রকমের গল্প, যত বেশী রকমের গান ও যত বেশী রকমের চরিত্র-চিত্রের সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন, তেমনটি করিতে এ দেশের আর কখনও কোনও নাট্যকার পারেন নাই।

সেক্সপীয়র-রচিত সকল নাটকেরই আখ্যান-বস্তু কোনও-না-কোনও প্রাচীন কাহিনী হইতে সংগৃহীত। সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই, কালিদাস, ভাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের নাটকাবলী পৌরাণিক কাহিনী-অবলম্বনেই লিখিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার কতকগুলি নাট্য-গ্রন্থের আখ্যান-বস্তুর জন্য যেমন এক দিকে ভারতের পুরাণ ও ইতিহাস, ভারতের ভক্ত- ও সাধক-জীবনী এবং বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন উপকথা প্রভৃতি মন্থন করিয়া-ছিলেন, তেমনি আবার অন্য দিকে তিনি তাঁহার অনেকগুলি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনের গল্প নিজের মন হইতেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভ্রান্তি,' 'মুকুল-মুঞ্জরা,' 'মনের মতন' প্রভৃতি নাটক এবং 'মোহিনী প্রতিমা,'

'স্বপ্নের ফুল' প্রভৃতি গীতিনাট্য এই কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার 'প্রফুল্ল,' 'বলিদান,' 'হারানিধি,' 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি সামাজিক নাটক-সমুদয়ের গল্পাংশের জন্যও তিনি নিজের কল্পনা-শক্তি ব্যতীত আর কাহারও নিকট ঋণী, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না।

এ কালের বঙ্গসমাজ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় গল্প-নাটকাদি লিখিবার চেষ্টা গিরিশের পূর্ব্বে অবশ্য অনেকেই করিয়াছিলেন; এবং সে চেষ্টার ফলে দুই-চারিটি ভাল সামগ্রীও যে উৎপন্ন না হইয়াছিল, এমন নহে। নাট্যক্ষেত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নই এ বিষয়ের প্রথম পথ-প্রদর্শক। যদিও প্যারীচাঁদ মিত্র-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"তিনিই প্রথম দেখাইলেন, যেমন জীবনে, তেমনিই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"—কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিত হইবার কিছু পূর্ব্বে রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর দেখা যায়, মধুসূদন, দীনবন্ধু, উমেশচন্দ্র মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি লেখকগণ রামনারায়ণেরই প্রদর্শিত পথে চলিয়া এমন কয়েকখানি নাট্য-গ্রন্থ রচনা করেন, যাহা শুধু সামাজিক নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি নহে—সেই সঙ্গে সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টি-পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' শিশিরকুমারের 'নয়শো রূপেয়া'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই।" ইহার কয়েক মাস পরে পুনরায় তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'ই লিখিলেন,—"নীল-দর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর। যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের জের ও জোর এখন অনেকটা কমিয়া আসিলেও তখনকার দিনে সাহিত্য-সমাজে ইহা প্রায় বেদ-বাক্যের ন্যায় গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার এই অভিমত সমর্থন করিবার জন্য ছোট ও বড় অনেক লেখকই সে-সময়ে অনেক প্রকার যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি যুক্তির উল্লেখ করা এ স্থলে নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ, সর্ব্বপ্রকার যুক্তির মধ্যে সেইটিই তখন সর্ব্বাপেক্ষা সারবান্ বলিয়া অনেকের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল, এবং তাহার সহিত গিরিশের সামাজিক নাট্য-রচনা-সৃষ্টির কতকটা কার্য্য-কারণ-স্বরূপ যোগ-সূত্রও দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রই ১২৮৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার 'জাল প্রতাপচাঁদে' বোধ হয়, প্রথম বলেন,—"এখন বাঙ্গালায় নাটক হইতে পারে না। নাটক উত্তর-প্রত্যুত্তর নহে, উপন্যাস নহে। যাহা লইয়া নাটক, তাহা বাঙ্গালীর অদ্যাপি হয় নাই। নাটকের মহা কার্য্যকারিতা, সে কার্য্যকারিতা ব্যক্তিগত নহে,—জাতিগত, সমাজগত। তাহা আমাদের কই?" পরে এই কথাটাই একটু ফুটাইয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার 'বান্ধবে' লিখিয়াছিলেন,—"মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের জীবন। এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। ...সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য-হেতু; কেবল গ্রন্থকারগণের দোষ নহে। এই জন্য আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে।" এই সব উক্তির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনও যে একটু-আধটু আমাদের কাণে আসিয়া পেঁছায় না, এমন নহে; কিন্তু সেকালে উহা কাণে কাণে ঘুরিয়া অনেকেরই মনে রীতিমত জাঁকিয়া বসিয়াছিল। কেবল একজন মাত্র—সে সময়কার সাহিত্য-রথীদের মধ্যে শুধু অক্ষয়চন্দ্র—এই অভিমতের প্রতি প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য-হেতু বাঙ্গালীর দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রকৃত নাটক যে রচিত হইতে পারে না, এই বাক্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ ১২৯৫ সালের 'নবজীবনে' সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"প্রাচীন গ্রীসের একটি বিশেষ সময়ে, এবং আধুনিক ইংলণ্ড, স্পেন, ফরাসী দেশের বিশেষ সময়ে, বড় বড় নাটককার জন্মিয়াছিলেন,—এইটি দেখাইয়া এস্কাইলস, সেক্সপীয়র, হুগো প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া, য়ুরোপীয় সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সভ্যদেশে যুদ্ধ-বিক্রমের, বাহ্য বল-বিপ্লবের, জড় জগতের সহিত মানবের কার্য্য-শক্তির বিশেষ প্রাবল্য হয়, তখনই নাটকের সৃষ্টি হইয়া থাকে।... আমরা কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় অনেকেই য়ুরোপীয় সমালোচকগণের মন্ত্রশিষ্য, কাজেই আমরা ঐ মতের অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালীকে নাটক লিখিতে নিষেধ করি; লিখিলে অবজ্ঞা করি, বিজ্ঞতা দেখাই; উপহাস করি, ঘৃণা দেখাই। কিন্তু সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত-মধ্যে আমরা যে নিয়ম স্থির করিতেছি, বা য়ুরোপীয়েরা স্থির করিয়া দিয়াছেন বলিয়া যাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, সেই নিয়মটি একটু বিচার-বিতর্ক করিয়া আমাদের এখনকার দিনে দেখা আবশ্যক।"

"আপাত দৃষ্টিতে নির্জীবপ্রায় এই বঙ্গসমাজে কতটুকু ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ...দুইটি বিভিন্নমুখী স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত বঙ্গসমাজে অনেককাল লীলা-খেলা করিতেছে। সমাজে, সংসারে, এমন-কি, স্ত্রী-পুরুষ-মধ্যেও ঘাত-প্রতিঘাত নিয়তই চলিয়াছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, এই ঘাত-প্রতিঘাত ততই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বাহ্যে ঘাত-প্রতিঘাত নাই বলিয়া অন্তরেও যে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে যে সমাজ অর্ন্তবাহ্যে সমানে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, জড়, অসাড়, উদাস, উদাসীন—সে সমাজে অবশ্য নাটক সৃষ্ট হইবে না। শুধু নাটক কেন?—তাহাতে দর্শন-বিজ্ঞান-ব্যবসায়-বাণিজ্য—অবশ্য মনুষ্য-ধর্ম্মের কিছুই থাকিবে না। তেমন জড় সমাজ বঙ্গসমাজ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালী কাঁদিতে শিখিয়াছে। অন্তর আলোড়িত হইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া না ফুটিলে কিছু বাষ্প উঠে না। বাঙ্গালী বহুকাল বাষ্প-বারি ফেলিতেছে। অনেক দিন হইতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার আকস্মিক আঘাতে বঙ্গসমাজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অভিভূত হইয়াছিল, অল্পে অল্পে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে। এই বিষম আঘাতের অল্প অল্প প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। এমন আন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কি নাটকের কিছুই উপযোগিতা নাই? তোমরা অমন করিয়া মাথা নাড়িলে চলিবে কেন? আমি তোমাদের কথা ত বিশ্বাস করিব না। আমি স্বয়ং একখানা জীবন্ত নাটক, আমার হৃদয়ে দুইটি প্রবল প্রতীপ স্রোতের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে; তোমরা আমাকে চিত্রিত করিলেই নাটক হইবে। তবে এ সময় নাটকের উপযোগী নয়—এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? আমি জীবন্ত নাটক, একথা বলিয়া আমি আত্ম-গরিমা করিতেছি না। 'আমি' অর্থ আমরা—আমি, তুমি, তিনি—সমগ্র শিক্ষিত সমাজ। আমরা শিরায় শিরায় পূর্ব্ব-পুরুষদের নিতান্ত নিষ্কামতা বহন করতঃ শিক্ষা-গুণে পশ্চিম-পুরুষদের একান্ত সকামতা পাইয়াছি। পাইয়া হইয়াছি—নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের গ্রন্থ—এক একখানি জীবন্ত নাটক। এরূপ আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতে আর কখনও হয় নাই। এমন অপূর্ব্ব সংঘর্ষণের ফল যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না, সে বিশ্বাস আমাদের হয় না।"

অক্ষয়চন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির ঠিকমত উত্তর দিতে না পারিলেও উহা যে কতকটা অত্যুক্তির অভিব্যক্তি, এমন কথা বলিবার চেষ্টা তখন একজন করিয়াছিলেন। এমন কি, সে চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের অঙ্গে অকারণে বিদ্রূপ-বাণও তখন বর্ষিত হইয়াছিল। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের 'মালঞ্চ' মাসিক পত্রখানি দেখিলেই তাহার প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিচার-বিতর্কের সময় গিরিশচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সত্যই তাহা স্মরণযোগ্য ঘটনা। তিনি স্বয়ং অবশ্য কোনও পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোনও কথা না কহিলেও, তাঁহার রচিত 'প্রফুল্ল' নাটক ঠিক সেই সময়েই ষ্টার ষ্টেজে দেখা দিয়া কেবল দর্শককুলকে চমৎকৃত নয়,—সেই সঙ্গে 'মালঞ্চে'র মন্তব্যকে বাতিল করিয়া অক্ষয়ের বাক্যেরই অক্ষয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিল। এ কথা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, 'নীলদর্পণ,' 'সধবার একাদশী,' 'সরলা' প্রভৃতির প্রাপ্য গৌরবটুকু 'প্রফুল্ল'কে প্রদান করিয়া আমরা তাহার অযথা প্রতিপত্তি-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা হইলে তিনি ভুল করিয়া বসিবেন; কারণ, 'নীলদর্পণ' বা 'সরলা'য় বাঙ্গালীর ঘর-সংসারের যে অংশটুকু প্রতিবিম্বিত দেখা যায়, তাহার সহিত অক্ষয়বাবুর বর্ণিত 'দুইটি বিভিন্নমুখী স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে'র বিশেষ কোনও সংস্রব নাই। 'সধবার একাদশী'তে তাহা আছে বটে, কিন্তু 'সধবার একাদশী' মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতার'ই একটা বর্দ্ধিত সংস্করণ। উহাতে নাটকের চেয়ে প্রহসনের রূপই বেশী প্রকট। 'দুইটি বিভিন্নমুখী স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে'র ভীষণ শোকোদ্দীপক চিত্র 'প্রফুল্ল' নাটকেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই।—যোগেশের 'সাজান বাগান' যে শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ্য কারণ যোগেশের 'মদ খাওয়া' বা 'ব্যাঙ্ক ফেল' হওয়া নহে। রমেশের পাপ-বুদ্ধিই এই 'ট্র্যাজেডি'র স্রষ্টি-কর্ত্তা। ইংরেজী লেখা-পড়া শিখিয়া, এটর্নি হইয়া সে ভাবিতে শিখিয়াছিল —"যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে?" মূর্খ শয়তান অপেক্ষা শিক্ষিত শয়তান আরও ভয়ঙ্কর। রমেশ সেই শিক্ষিত শয়তান। তাই যোগেশ তাহাকে বলিয়াছিল—"ভ্যালা মোর ভাইরে,—চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল!—কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান করতে পারতে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেব না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।"

এখানে আরও একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা নাটকে যে গুণের অভাব অনুভব করিয়া 'বঙ্গভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই' বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই গুণেরও সম্যক্ পরিচয় বাঙ্গলা সামাজিক নাট্য-গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'প্রফুল্ল'ই প্রথম দিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন,—"যে-যে গুণ থাকাতে হাম্‌লেট, ম্যাক্‌বেথ, ওথেলো প্রভৃতি

জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্য-রূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি গুণের কথা বলি—মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি-দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা ভাল নাটকে সুন্দররূপে চিত্রিত থাকে। …কি কৌশলে, কিরূপে মানব-চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।"—বঙ্কিমবাবুর এই বিবৃতি-অনুসারে নাটকমাত্রেরই যে বিচার হওয়া উচিত, অবশ্য এমন কথা বলি না; কারণ, নাটকত্ব-বিচারের উহা ঠিক মাপকাঠি নহে। তাহা করিতে গেলে, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের নহে—পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেরও অনেক কাল হইতে ভাল বলিয়া বিখ্যাত অনেক নাটককেই নাটকের কোঠা হইতে নামাইয়া দিতে হয়। তবে নাটকীয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া মানসিক পরিবর্ত্তনের চিত্র ঠিকমত ফুটাইয়া দেখাইতে পারা যে একটি অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, বঙ্কিমচন্দ্র নাটক লিখিয়া না হউন, তাঁহার 'মৃণালিনী' উপন্যাসে যে পশুপতি-চরিত্র আঁকিয়াছিলেন, বঙ্গ-সাহিত্যে সেইটিই মনে হয়, 'মানসিক পরিবর্ত্তনে'র সর্ব্বপ্রথম চিত্র। অনেক বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালী লেখকগণের প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার 'বিষবৃক্ষ,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'সীতারাম' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাসে 'মানসিক পরিবর্ত্তনে'র অতি মনোহর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু শুনিলে হয়ত অনেকে বিস্মিত হইবেন যে, এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার কাছে আর সকলের কৃতিত্বই ছোট হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে তাঁহার অন্য সব নাট্য-গ্রন্থ বাদ দিয়া শুধু যদি ছয়খানি সামাজিক নাটক হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, সেই সকল নাটকান্তর্গত যোগেশ, হরিশ, করুণাময়, কালীকিঙ্কর, মোহিনী, মোহিত, প্রসন্নকুমার, দুলাল, অঘোর, ভজহরি, মদন দাদা, শৈলেন, সুরেশ প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রই মানসিক পরিবর্ত্তনের পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধরিয়া সে উদাহরণ-মালাকে বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে। গিরিশ-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই বা পরিচয় অত্যল্প, তাঁহারা আমাদের এ কথা শুনিয়া কি বুঝিবেন, বলিতে পারি না। তাঁহাদিগকে কেবল একটুকু এখানে বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালা নাটক-নভেলে সচরাচর যেমন অদ্ভুত ভাল লোক হঠাৎ অতি মন্দ, এবং অদ্ভুত মন্দ লোক হঠাৎ অতি ভাল হইয়া যায়, তেমন উদ্ভট মানসিক পরিবর্ত্তনের ছবি মনে করিয়া কেহ যদি গিরিশ-সৃষ্ট চরিত্র-সম্বন্ধেও ঐরূপ

কিছু-একটা ধারণা করিয়া বসেন, তাহা হইলে মানব-চরিত্র-রহস্যবিৎ গিরিশ-চন্দ্রের প্রতি বিশেষ অবিচার করাই হইবে।

এখানে সকলকে একবার 'প্রফুল্ল' নাটকের প্রধান চরিত্র যোগেশের কথা স্মরণ করিতে বলি। যোগেশ নিজের পরিবর্ত্তনের কথা নিজেই বলিয়াছে,—সে এক বড় বিচিত্র মুন্সীয়ানা। নাটকের ঘটনা-স্রোত চলিয়াছে—তাহাতে নাটকীয় চরিত্র-সকল ফুটিতেছে, আর সত্যবাদী, সদাশয় ও ধর্ম্মভীরু যোগেশের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের রূপটুকু মাঝে মাঝে বিবৃত হইতেছে,—অথচ বিবৃতি যে চলিয়াছে, তাহা আদৌ ধরা যায় না। সকল বিবৃতির সার কথাটুকু চতুর্থ অঙ্কের শেষ ভাগে আছে।—যোগেশ একজন মাতালকে বলিতেছে,—" যেও না, শোন, একটা কথা শোন,—একজন যোগেশ ছিল, সে তোমাদের ছুঁতো না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে নাইতো। তার একটি স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়াতো ; একটি ছেলে ছিল, তারে কোলে নিত, চুমো খেতো। দিন গেল, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল। বলে যোগেশ,—যোগেশ কি না কে জানে! এ যোগেশ কে, তা জান? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালালো, স্ত্রীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বাক্স নিয়ে চলে এলো ; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে—প্রাণে একটু লাগলো না। কারুকে সে চায় না! বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি? সে কি এ?"—মানব-চিত্তের এই পরিবর্ত্তন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত-সাহায্যে অতি কৌশলের সহিত নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সেক্সপীয়রের স্বষ্ট চরিত্রাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন,—" জগতের কোন কবিই বোধ হয় এত প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধি-স্বষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতা নাই।"*—বিলাতী সমালোচনায় এরূপ মন্তব্য অবশ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সে জন্য আমরা বিশেষ-কিছু মনেও করি না ; কারণ, বিদেশীয় লেখকেরা 'জগৎ' বলিতে সচরাচর পাশ্চাত্ত্য দেশই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যে দেশের জাতীয় সম্পত্তি, সে দেশেরই যদি কেহ বলেন যে, 'জগতের কোন কবিই সেক্সপীয়রের ন্যায় এত প্রকারের চরিত্র-কল্পনা করিতে পারেন নাই'—তবে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারি না। পক্ষান্তরে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—" এখনও পাঁচ-সাতটা

* সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩০৫।

সেক্সপীয়রকে আসিয়া শিখিতে হইবে—ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাক্‌বেথ, হেম্‌লেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়র-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিত্রাদেশে মাতার মস্তকচ্ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশু-বধ নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জনা নাই।"—ইহাই আমাদের অন্তরের কথা, এবং এই কথার ভিতরে গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণ ও চরিত্র-স্থষ্টির স্বরূপটুকু ধরিবারও একটু ইঙ্গিত আমরা দেখিতে পাই।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যসাহিত্যে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি নর-নারীর চরিত্র-চিত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে মোটা-মুটি হিসাব করিলে দেখা যায়, তাহার সংখ্যা আট শতের কম নহে, এবং সেই আট শতের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত হইতেছে পুরুষ-চরিত্র ও প্রায় আড়াই শত হইতেছে স্ত্রী-চরিত্র। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল চরিত্রের মধ্যে এমন চরিত্র বোধ করি অতি অল্পই আছে, যাহাকে দেখিলে মনে হইবে, ইহাকে যেন তাঁহার একাধিক নাটকে একাধিক নামে দেখিয়াছি।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-স্থষ্টি-প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় একবার লিখিয়াছিলেন,—"সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক, ইংরাজী সাহিত্যের বফুন ফল্‌ষ্টাফ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের বিদূষক বা বরুণচাঁদ প্রভৃতি সন্নিহিত হইতে পারে না।"—কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, গিরিশের 'বিদূষক' বলিলে একটি-মাত্র চরিত্র বুঝায় না। তাঁহার 'জনা'র বিদূষকের সহিত তাঁহার 'নল-দময়ন্তী'র বিদূষকের কোনই সাদৃশ্য নাই। আবার তাঁহার 'ধ্রুব-চরিত্রে' যে বিদূষককে দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃতিও ঐ দুই বিদূষক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারপর, তাঁহার রচিত শেষ-নাটক 'তপোবলে' তিনি সদানন্দ নামে যে বিদূষক-চরিত্রের স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব্ব। তাহাকে দেখিবার সময় উপরি-উক্ত তিনটি বিদূষকের মধ্যে কোনও একটিকে, অথবা তাঁহার স্বষ্ট কোনও এক কঞ্চুকীকে একবারও মনে পড়ে না।

'পাণ্ডবগৌরবে'র কঞ্চুকী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র। সংসারে যেমন একজনের মুখের সঙ্গে আর একজনের মুখের অবিকল মিল দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি এই সকল চরিত্রের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই পরিদৃষ্ট হয় না। গিরিশচন্দ্রের স্বষ্ট বারাঙ্গনা-চরিত্রগুলিও এই উক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার নাট্য-গ্রন্থাবলীতে সোণা, গঙ্গা, মোহিনী, সোহিনী, চিন্তামণি, থাকমণি, উজ্জ্বলা, কাদম্বিনী প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র যতগুলি আছে, তাহাদের কথাবার্ত্তা ও কার্য্যাবলীর প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, আর

সকলেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এমন কি, পুরাণের দুই-চারটি অপ্সরার চরিত্রেও তিনি এমন নূতনতার সমাবেশ করিয়াছেন, যাহাতে একটির সহিত অন্যটির চরিত্রগত বৈষম্য সহজেই চোখে পড়িয়া যায়। কথাটাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহার অঙ্কিত দুইটি অপ্সরার চরিত্রের একটু পরিচয় এখানে প্রদান করিতেছি।

তাঁহার 'পাণ্ডবগৌরবে'র এক স্থানে উর্ব্বশী দুঃখ করিয়া বলিতেছে,—

"এত ছিল ভালে, নরে স্পর্শে অহর্নিশি!—
স্পর্শ লাগে অঙ্গার সমান।
* * *
দেবাশ্রিতা, দেবের বাঞ্ছিতা—
মানবের ভোগ্যা এবে,
মৃত্তিকা-গঠিত যার কায়!"

গিরিশের 'তপোবল' নাটকেও উর্ব্বশীর মুখে আমরা এই ভাবেরই কথা শুনিতে পাই।—এই মর্ত্ত্যের প্রতি তাহার দারুণ বিতৃষ্ণা। কিন্তু গিরিশ-চিত্রিত মেনকার মনোভাব অন্যপ্রকার। 'তপোবলে' উর্ব্বশী যখন মেনকাকে বলিল, —"হ্যাঁলা, তুই অপ্সরার নাম ডোবালি যে! সাধের প্রাণে বেড়ি প'রলি? তুই দেব-কুসুমের ভ্রমরী হ'য়ে নরের অনুরাগিণী হ'লি।" তখন ইহার উত্তরে মেনকা কহিল,—

"সখি, পাও নাই প্রেমের আস্বাদ,
তাই হেন কহ বাণী।
কাম-পিপাসার বারি অপ্সরা ত্রিদিবে।
* * *
স্বর্গ-সুখ—প্রেমহীন কাম-ক্রিয়া!
প্রণয়ের বিমল আস্বাদ
পেতে সাধ হ'তেছে হৃদয়ে;
পূজি' বিশ্বামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব, সজনী!"

একজন মানুষ যে কেমন, তাহা বুঝিতে হইলে, কিসের প্রতি তাহার অনুরাগ ও কিসের প্রতি তাহার বিরাগ, তাহা জানিতে হয়। সুতরাং উর্ব্বশী ও মেনকা যে কেমন, তাহারা উভয়ে চরিত্রগত যে কত ভিন্ন, তাহা আশা করি, উপরি-উদ্ধৃত উভয়ের উক্তি হইতেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। তবে কেহ কেহ

হয়ত ভাবিতে পারেন যে,—'হাঁ, দুইটি অপ্সরা দুই রকমের হইয়াছে বটে, কিন্তু নাটকীয় ঘটনা-বিকাশের সহিত মেনকার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কোনও রূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায় না।' —তপস্বীর তপোভঙ্গের পক্ষে অপ্সরার হাব-ভাব ও ছলা-কলাই যে অনেক সময় যথেষ্ট কার্য্যকরী হয়, এ কথা অবশ্য আমরাও জানি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গই একমাত্র প্রধান ঘটনা নহে। এই সঙ্গে শকুন্তলার ন্যায় মহীয়সী মহিলার জন্মকথাটুকুও সবিশেষ স্মরণযোগ্য। যিনি ইহা মনে রাখিয়া মেনকার 'পূজি বিশ্বামিত্র, চিত্ত তৃপ্ত করিব' কথাটির সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব্ব সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরই একটি উক্তি মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—"সেক্সপীয়র অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির অতি অদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছেন, কিন্তু মহাকবি ব্যাসদেবের দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কোথা হইতে উদ্ভব, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন।" অবশ্য ব্যাসদেবের তুলনা এ জগতে একমাত্র ব্যাসদেবই। তবে গিরিশচন্দ্র যে-হিসাবে তাঁহার সহিত সেক্সপীয়রের নাম করিয়াছেন, আমরা কতকটা সেই হিসাবেই এখানে বলিতেছি যে, গিরিশচন্দ্রেরও অনেক ছোট ও বড় চরিত্র-সৃষ্টিতে ঐ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা যদি তাঁহার নাটকাবলীর সব চরিত্র ও সব ঘটনার রহস্য বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে অনেক সময়েই সঙ্গতকে অসঙ্গত ও সুন্দরকে অসুন্দর মনে করিয়া মহা ভুল করিয়া বসিব।

বলিতে কি, এইরূপ ভ্রমই আমি নিজে একবার করিয়াছিলাম। তাঁহার 'সৎনাম' নাটকের 'গুলসানা' নামে নায়িকা-চরিত্রের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম,—"আপনার সৃষ্ট এই নায়িকা-চরিত্রটি কেমন-যেন একটু অসঙ্গত—একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। যে নারী পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধকামনায় শত্রু-পক্ষের নায়ককে প্রেমের ফাঁদে ধরিতে গিয়া নিজেই সেই ফাঁদে আটকাইয়া পড়ে, তাহার হৃদয়ে তারপর আর প্রতিহিংসার তৃষা থাকে, কিনা, সন্দেহ। যদিও প্রতিশোধের সাধ মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে সে রমণী নিহত নায়কের অনুমৃতা হইয়াছিল, তবু যেন এই ব্যাপারের মধ্যে একটু উৎকটতার গন্ধ পাই।"

ইহার উত্তরে গিরিশচন্দ্র আমাকে যাহা বলেন, তাহার সার-মর্ম্ম এই—"দুষ্মন্তের মুখে প্রত্যাখ্যানের কথা শুনিয়া শকুন্তলা তাঁহার প্রতি যে তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় সীতা তাহা পারিতেন কি? সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার বনবাস ও সীতার পাতাল-প্রবেশ প্রভৃতি কোনও সময়েই

সীতা স্বামীর প্রতি ঐরূপ কটু ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি সর্ব্বসহা ধরিত্রীর কন্যা। কিন্তু শকুন্তলা অতি স্নেহশালিনী ও কোমলস্বভাবা হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, তিনি স্বর্গ-বেশ্যা মেনকার গর্ভজাত। সুতরাং তাঁহার মুখে ঐ তিরস্কারের ভাষা অসঙ্গত হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে, বরং উহাই স্বাভাবিক। সৎনাম নাটক পড়িবার সময়েও মনে রাখিও, উহাতে বৈষ্ণবী ও গুলনানা নামে যে দুইটি তেজস্বিনী যুবতীর চরিত্র আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটি এক সৎনামী পণ্ডিতের কন্যা এবং দ্বিতীয়টি মুসলমান নবাব-দুহিতা। বৈষ্ণবী তাহার রাজপুত-জননীর কৌমারী ব্রতের ফল, আর গুলনানা আশৈশব সুখৈশ্বর্য্যের কোলে লালিতা-পালিতা। তাই উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ এক হইলেও, অর্থাৎ পিতৃ-বধের প্রতিশোধ-কামনায় উভয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও, দুই জনের চরিত্র-গত মূল-তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের জীবনের ঘটনা-স্রোতও সেই হিসাবে দুই ভিন্ন পথে বহিয়া গিয়াছে। আসল কথা, এই দুই রমণী-চরিত্রের বীজ-শক্তি সমঝাইয়া যদি তাহাদের কথা ও কাজগুলি বুঝিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে সেই সকল কথা ও কাজের মধ্যে উৎকটতার পরিবর্ত্তে একটা একত্ব ও অঙ্গাঙ্গী বা Organic সম্বন্ধই দেখিতে পাইবে।" গিরিশচন্দ্রের এই সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ মন্তব্য-টুকু শুধু তাঁহার সৎনামের সৌন্দর্য্য নয়,—পরে তাঁহার আরও অন্যান্য নাটকের বহু চরিত্রের বিশেষত্ব ও বহু ঘটনার সার্থকতা-উপলব্ধির পক্ষে আমাকে যে কত রকমে সাহায্য করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, গিরিশের নাট্য-সাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্যকলার একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারি না। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য তিনি অবশ্য রীতিমত অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দুই সাহিত্যের দ্বারা তিনি যে কিছু প্রভাবিত হন নাই, এমন কথা বলি না। বরং সেরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করি; এবং তাঁহার নাট্যসাহিত্য অনুসন্ধান করিলে সে প্রভাবের নিদর্শনও যে তাহাতে পাওয়া যাইবে, তাহা জানি ও বুঝি। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্য-রীতির জোড়া-তাড়া দিয়া তিনি যে নাটক তৈয়ারী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিবার কোনও হেতু দেখি না। তাহা হইলে, তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল', 'নসীরাম', 'কালাপাহাড়', 'জনা', প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি নাটকগুলির যে আকার আমরা দেখিতে পাইতেছি, সে আকারে তাহাদের দেখিতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হইত। এই সকল নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি যে ভাবে যতখানি চলিয়াছে, এবং যেখানে

যে ভাবে আসিয়া থামিয়াছে, তাহা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোনও নাট্য-রীতিরই অনুমোদিত নহে। বণিক-পত্নীর নিকট হইতে কাঁটা চাহিয়া লইয়া বিল্বমঙ্গল যেখানে আপনার চক্ষু দুইটি বিদ্ধ করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র বিলাতী নাট্যকলার অনুকারী হইলে, সেইখানেই তাঁহার নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। আর যদি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির জীবন-ঘটনা লইয়া নাটক লিখিবার সাধ বা সাহসই তাঁহার মনে কখনও জাগিত না।

বাস্তবিক, বিল্বমঙ্গল নাটক-রচনায় কবির শুধু অসামান্য প্রতিভা নয়,—অসামান্য স্বাধীন চিত্তেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে, যে সময়ে মিল্টন, বায়রন, শেলী প্রভৃতির কাব্য-বিচারের আদর্শে এ দেশের কবিগণের কাব্য ও কবিতার গুণাগুণ নির্ণীত হইতেছিল, যখন লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী হামলেটের অনুকরণে 'নন্দ বংশোচ্ছেদ' নাটক লিখিয়াছিলেন, এবং হরলাল রায় ম্যাক্‌বেথ নাটকের ভাবানুবাদ করিয়া ম্যাক্‌বেথকে 'রুদ্রপাল'-নামে চালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আমাদের সেই প্রবল মানসিক পরাধীনতার যুগেই গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গল নামে এক ব্যভিচারী পুরুষ ও চিন্তামণি নামে এক হৃদয়হীনা বারাঙ্গনাকে নাটকের প্রধান নায়ক-নায়িকা করিয়া তাহাদের মানসিক পরিবর্ত্তনের এক অভিনব চিত্র-প্রদর্শনে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন।

গিরিশের 'মোহিনী প্রতিমা'র কথা অবশ্য ভুলি নাই। 'বিল্বমঙ্গল' নাটক প্রকাশেরও প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে, মানসিক পরিবর্ত্তনেরই এক মৌলিক ও মনোরম চিত্র বুকে করিয়া বঙ্গ-নাট্যক্ষেত্রে যে উহা সর্ব্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল, তাহা উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু 'মোহিনী প্রতিমা' একখানি নাটক নহে,—উহা আদিরসাশ্রিত গীতিনাট্য। গীতিনাট্য- এবং প্রহসন-প্রণয়নেও তিনি যেরূপ 'নব নব উন্মোষশালিনী বুদ্ধি'র পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য। কিন্তু সে সব কথার আলোচনা এখন বন্ধ রাখিয়া তাঁহার ভক্তি-মূলক নাটকের নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বিল্বমঙ্গলাদি নাটক-অবলম্বনে যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাই এইবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা এই যে, আমরা যদি গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, অনাথনাথ, আলোক প্রভৃতি চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বলি যে, একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি-দ্বারা ভাল পথে কিরূপে যায়, তাহা ঐ সকল চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইলে ঠিক বলা হইবে না। এই সকল চরিত্রে মানব-চিত্তের যে পরিবর্ত্তন আমরা দেখিতে পাই, তাহার রূপ সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র। আদিরসের মূর্ত্তি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভক্তিরসের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়, ঐ সকল চরিত্র তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া এইরূপ অতীন্দ্রিয়ের বিকাশ—রূপান্তরের এইরূপ মনোবিজ্ঞান-সম্মত মনোরম চিত্র, গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কাহাকেও আঁকিতে দেখি নাই, এবং তাঁহার পরেও এ বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রামপ্রসাদের গানের মতন গান যেমন শুধু প্রতিভা থাকিলেই লেখা যায় না, তেমনি এ জাতীয় চরিত্রাঙ্কন করা শুধু প্রতিভার কার্য্য নহে। নাট্য-সাহিত্য-জগতে বাস্তবিকই ইহা এক নূতন সামগ্রী।

কিন্তু এই নূতনত্বের আস্বাদনে দেশের জনসাধারণ পরম তৃপ্তি লাভ করিলেও যাঁহাদের হাতে তখন নাটকের গুণাগুণ-ওজনের দাঁড়িপাল্লা ছিল, তাঁহাদের অনেকেই ঐ সব নাটক দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়াছিলেন! ফরাসী ভাবুক জুবেয়ার বলিয়াছেন,—"ব্যবসাদার সমালোচকেরা আকাটা হীরা বা খনি হইতে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করিতে পারে না। ট্যাকশালের চল্‌তি টাকা-পয়সা লইয়াই তাহাদের কারবার। তাহাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে, কিন্তু নিকষ-পাথর অথবা সোনা গালাইয়া দেখিবার মুচি নাই।" * বাস্তবিক, গিরিশচন্দ্রেরও ঐ সব "খনি হইতে তোলা সোনার" ঠিকমত দর এখনও যে আমরা যাচাই করিতে পারিয়াছি, এমন মনে হয় না। মনে পড়ে, বিপিনচন্দ্রের ন্যায় চিন্তাশীল লেখকও তাঁহার "ধর্ম্ম, নীতি ও আর্ট" নামক প্রবন্ধের একস্থলে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"বারবনিতাকে আশ্রয় করিয়াও যে অতি শ্রেষ্ঠ আদিরস ফুটিতে পারে, গিরিশবাবুর 'বিল্বমঙ্গল' তাহার সাক্ষী। এখানে আমি কৃষ্ণ-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, কিন্তু চিন্তামণি-প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গলের কথাই বলিতেছি। বিল্বমঙ্গল যদি ভক্ত-রূপে ফুটিয়া নাই উঠিতেন, তাহাতেও তাঁহার এই অপূর্ব্ব রস-মূর্ত্তি অপূর্ণ থাকিত না; হয়ত বা তাহা হইলে, বিল্বমঙ্গল নাট্য-হিসাবে, রস-চিত্র-হিসাবে বর্ত্তমান বিল্বমঙ্গল অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত।"

কিন্তু বিল্বমঙ্গল-চরিত্রের মূল সূত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিলে, পাল মহাশয়ের অনুমানকে বিচার-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গিরিশচন্দ্রের রচিত কোনও একখানি নাট্যগ্রন্থের একজন নায়ক বলিয়াছে,—"যে রূপের ছটায় মানুষকে উন্মাদ করে, সেই রূপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে উচ্চ প্রবৃত্তিও জাগরিত কর্‌তে পারে।"—এই কথা তাঁহার

* আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'মোহিনী প্রতিমা', 'বিল্বমঙ্গল', 'নসীরাম', 'কালাপাহাড়', 'করমেতি বাঈ,' 'সৎনাম' প্রভৃতির কাহিনীসমূহের মূল কথা। কিন্তু কাহিনীগুলির মূল কথা এক হইলেও নাটকগুলির মূল তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর এই মূল তত্ত্বের বিভিন্নতা, নাটকের কেন্দ্রস্থ চরিত্রের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য বা বিশেষত্ব-বশতঃ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ্যাগত-প্রাণ বিল্বমঙ্গলকে কোনও রকমে টানিয়া-বুনিয়া কৃষ্ণগত-প্রাণ বিল্বমঙ্গল করিয়া মানসিক পরিবর্ত্তনের একটা নূতন ধরণের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা যদি এ গ্রন্থে কিছু-মাত্র লক্ষিত হইত, তাহা হইলে ইহাকে 'নাটক' নামে অভিহিত করিয়া ইহার গুণ-কীর্ত্তন করা দূরে থাকুক, ইহার নামোল্লেখও করিতাম না। নাটকের প্রথমেই দেখিতে পাই, বিল্বমঙ্গল বলিতেছে,—"আমি দেখে নেবো, দেখে নেবো, দেখে নেবো।" —এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বসূচক বাক্যে নাটকের আরম্ভ গিরিশেরই 'দক্ষযজ্ঞ', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' প্রভৃতি দুই-চারিখানি নাটক ছাড়া আর কাহারও কোনও নাটকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যাহা হউক, বিল্বমঙ্গল নাটকের ঐ প্রথম ছত্র—'দেখে নেবো'—কথাটার দাম যে কত বেশী, উহার সার্থকতা যে কি, তাহা নাটকের শেষ-দৃশ্যে যখন চিন্তামণি আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে বলে—"চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী, দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।"—তখনই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং এই শেষ অংশকে বাদ দিলে কেবল নাটকের আখ্যান-ভাগই নষ্ট হয় না, —বিল্বমঙ্গল এবং চিন্তামণিও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। হৃদয়ের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় কার্য্য-স্রোত কেমন স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুটিয়া চলিয়া বিল্বমঙ্গল নাটকের সমগ্র 'প্লট' ও সমুদয় চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যকে কিরূপ চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণপূর্ব্বক বিস্তারিতভাবে দেখাইবার সাধ হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহার অবসর হইবে না। তাই শুধু বিপিনচন্দ্রের উক্তির উত্তর-স্বরূপমাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, বিল্বমঙ্গল যখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল যে, সে এত দিন যে রূপের পূজা করিয়াছে, সে রূপ কাম-দৃষ্টিতে 'অতি সুন্দর' হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা রাক্ষসীর রূপ, তখন শুধু সেই রূপের জাল ছিন্ন করিবার তীব্র আকাঙ্খা নয়, সেই সঙ্গে অনন্ত রূপাধারকে দেখিবার সাধও তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন সে আন্তরিক আকুলতার সহিত বলিয়াছিল,—"আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে,—আমিই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চি নি; নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গ-মধ্যে কে আমায় শব-দেহ-ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় বলে দিলে—'সংসারে আমার কেউ নাই।' কে আমায় এখন বল্‌চে—'আমি তোর আছি।' কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও,

কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও!"—এই উক্তির পর বিল্বমঙ্গল যদি ভক্তি-সাধন-পথে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে রস-চিত্র-হিসাবে ও নাট্য-হিসাবে এ গ্রন্থের আমরা অপ্রশংসাই করিতাম। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "কাম ঈশ্বরে অর্পিত হইলে ভাবের অত্যুৎকৃষ্ট ভাব—মধুর ভাব লাভ হয়।"—তাঁহার এই বাক্যেরই জীবন্ত উদাহরণ তাঁহার চিত্রিত বিল্বমঙ্গল-চরিত্র। বিল্বমঙ্গলের ভক্ত-জীবন তাঁহার চিন্তামণি-গত জীবনেরই পরিণতি মাত্র। এইরূপ পরিণতিকেই রূপান্তর বলে। রূপান্তর বলিতে বিচ্ছেদ বুঝায় না। বীজ হইতে অঙ্কুরের রূপান্তর, অঙ্কুর হইতে গাছের রূপান্তর বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়া ঘটে না।

ভক্তিরসকে প্রধান করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রায় ১২।১৩খানি নাট্য-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কাব্যরসের স্বাদ-হিসাবে ঐ সকল নাটকের প্রত্যেকখানিই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভক্ত- ও সাধক-চরিত্রের অনেক জটিল—অনেক দৃষ্টির অগোচর অংশের উপর তিনি এমন উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা দেখিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। অথচ সে জন্য নাটকত্বের দিক্ দিয়া তাঁহার কোনও নাটক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বরং বলিব, রস-তত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্তকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, নাটকীয় ঘটনা-স্রোতের গতির সহিত নাটকীয় চরিত্রের উন্মেষ-সাধনে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সে কৃতিত্ব অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। দুই-একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলিয়াছিলেন, "যেমন কর্ম্মী তেজস্বী ব্রাহ্মণ-ডাকাতের হাত দিয়া কবি দেবীরাণীকে গড়িয়া তুলিলেন, সে গড়নের ফলে পুরুষ ব্রজেশ্বর সোণা হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু কবি প্রফুল্লের সংস্পর্শে ব্রজেশ্বরের মানবতার উন্মেষ-ভঙ্গী দেখান নাই।....গীতার হিসাবে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করাইয়া, নিষ্কাম-ধর্ম্মের ছবি আঁকিলে ব্রজেশ্বরেও প্রফুল্লের স্বামি-বোধ থাকিবে না; ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিশালতায় মিশিয়া যাইবে। তাই প্রফুল্ল-চরিত্র একটা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। উহাকে শাস্ত্রের মাপকাঠিতে কিংবা ইউরোপীয় দর্শনের মাপকাঠিতে মাপিলেও পাওয়া যাইবে না।"—পাঁচকড়িবাবুর এই মন্তব্যটুকু মনে রাখিয়া গিরিশের 'করমেতি বাঈ' যিনি পাঠ করিবেন, তাঁহাকে কিন্তু আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ পাইতে হইবে না। করমেতি বাঈ-এর সহিত দেবীরাণীর তুলনা অবশ্য করিতেছি না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই, দেবী

চৌধুরাণীতে গীতা-সিদ্ধান্তের যেমন ছড়াছড়ি আছে, উক্ত নাটকে তাহার নাম-গন্ধও নাই ; কিন্তু যাহার নামে নাটকের নামকরণ হইয়াছে, তাহার কথা-বার্ত্তা শুনিলে, তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিলে, মনে হয়, উহা যেন গীতা-সিদ্ধান্তেরই সজীব ও সাবয়ব মূর্ত্তি।—যে মনোবুদ্ধি সত্যই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, সে মনোবুদ্ধিতে স্বামি-বোধ বা সংসার-বোধ যে কিছুতেই জাগে না, তাহা করমেতি বাঈকে দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। নাটকের প্রথমাংশে আছে, করমেতি বাঈ-এর স্বামী আলোক করমেতিকে বলিতেছে, "তোমার শ্যাম যে হোক, তাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়োবে না। আমার প্রাণ জুড়োয় তোমায় দেখে। তুমি শ্যামের জন্যে পাগল, আমি তোমার জন্যে পাগল। তুমি শ্যামের পিছনে ফিরবে, আমি তোমার পিছনে ফিরবো। তোমার শ্যাম হয় হোক, আমার কিন্তু তুমি।" —ইহার উত্তরে করমেতি বলিল, "তুমি কি বলচো—তোমার আমি? আমি কি তোমার শ্যাম? শ্যামের যদি শ্যাম থাকতো, আমি শ্যামকে খুঁজে দিতুম। আমি যদি তোমার শ্যাম, আমার শ্যামকে খুঁজে দাও।" তখন স্বামী বলিল, "আগে তোমায় চিনি, তারপর তোমার শ্যামকে চিনবো, তারপর তারে খুঁজে এনে দেবো।"—পরিণামে দেখিতে পাই, স্ত্রীর সংস্পর্শে স্বামী সত্যই সোণা হইয়া গিয়াছে। নাটকের শেষ অঙ্কে একজনকে সে বলিতেছে, "কিছুই বুঝতে পাচিচ নি। ভেবেছিলুম করমেতিকে চাই, সে বিনা সংসার শূন্য। এখন দেখছি—শ্যামকে চাই।"

এই সব চরিত্রের উন্মেষ-ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি যে, স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছে, "আমি কি তোমার শ্যাম?" অথবা পুত্র মাতাকে বলিতেছে :

"কৃষ্ণ বলে' কাঁদ মা জননি,
কেঁদ না 'নিমাই' বলে'।
কৃষ্ণ বলে' কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে 'নিমাই' বলে' নিমাই হারাবে।"

কিংবা বারাঙ্গনাকে বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন, "এ কি! গুরু? প্রেম-শিক্ষা-দাতা? বিশ্ব-মোহিনি, আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম করণ)।"

এই সকল উক্তির মর্ম্ম বিলাতী মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বুঝিতে গেলে হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইবে, কিন্তু আমাদের দেশের সাধন-তত্ত্ব বা সাধক-জীবনীর সহিত যাঁহাদের কিছু পরিচয় আছে, তাঁহারা উহাতে ভক্ত-ভেদে ভাব-ভেদের স্বাভাবিক স্ফুরণ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইবেন না। গিরিশচন্দ্রকে

স্বয়ং পরমহংসদেব একবার বলিয়াছিলেন, "তীব্র বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেমন করে' ভগবান্‌কে পাবো।" গুরু বল্লেন, 'আমার সঙ্গে এসো'—এই বলে' একটা পুকরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বল্লেন, 'তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল?' শিষ্য বল্লে, 'আমার প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায় যায়।' গুরু বল্লেন, 'দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে, তবেই তাঁকে লাভ করবে।'" গুরু-বর্ণিত এই তীব্র বৈরাগ্যের—এই প্রাণ 'আটু-বাটু'র ভাব মানুষের কথার ও কাজের ভিতর দিয়া কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই গিরিশের নানা নাটকে নানা আকারে বিকশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ বলিতেন, "সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়।"—মানব-চিত্তের এই জোয়ার-ভাঁটার বৈচিত্র্যময় চিত্র দেখিতে হইলে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রদর্শনীই, বোধ হয়, একমাত্র স্থল।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের আরও একটি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের কথা এখানে বলা আবশ্যক। কথাটা এই যে, শুধু ভক্তি ও ভালবাসার আকর্ষণে নয়—বৈর-ভাবের আন্তরিক আহ্বানেও যে ভগবান্ না আসিয়া থাকিতে পারেন না, তাহার সমুজ্জ্বল চিত্রও তাঁহার নাট্যসাহিত্যে সমুদ্ভাসিত দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগ-বতের সপ্তম স্কন্ধের একস্থানে আছে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"বৈর-ভাবে মর্ত্ত্য-মানব যত সহজে ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিতে পারে, ভক্তিযোগ-দ্বারা তত সহজে পারে না, ইহাই আমার নিশ্চয় মত।"—দেবর্ষির এই সিদ্ধান্ত-বাক্য গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ-বধের' রাবণে এবং তাঁহার 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র হিরণ্যকশিপুতে যেন সজীব মূর্ত্তি হইয়া দেখা দিয়াছে। অথচ এই একজাতীয় দুইটি চরিত্রের মধ্যে পুনরুক্তি-দোষ কেহ দেখিতে পাইবেন না। 'রাবণ-বধে' আছে, মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যখন নানা ভাবে বুঝাইতেছেন, তখন রাবণ বলিলেন:

"সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কিবা রাণী মন্দোদরি!
জানিয়াছি রক্ষঃ-বংশ ধ্বংস এত দিনে।
কিন্তু ছার প্রাণ-হেতু—
মান-বিসর্জন কদাচন করিব না।
- -

নিজ শির ছেদি' নিজ করে
যাচিনু অমর-বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল অধীনে,—
না দিল অমর-বর!
ক্ষোভ নাহি তাহে—
মরিয়ে অমর আমি হ'ব, মন্দোদরি!"

এই কথার উত্তরে মন্দোদরী কেবল বলিলেন, "হায়! অভাগিনী আমি।" স্ত্রীর এই দীনতা-ব্যঞ্জক বাক্যে দর্প-দম্ভের অবতার রাবণের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধ উৎস তখন অসংবরণীয় বেগে বাহির হইল:

"অভাগিনী তুমি!—
পতি-ভাগ্যে ভাগ্যবতী নারি,
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ মম সম!
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণ-গান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি—
ব্রহ্মা-সনাতন রাজীব-লোচন
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে।
জীবমাত্র বহে দেহ-ভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে;
কিন্তু, হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে!
এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহ-ভার,
ছার রাবণ-সংহার-হেতু!"

মাইকেল মধুসূদন রাবণকে বড় করিতে গিয়া রাম-চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, কিন্তু গিরিশের রাবণ রামকে বড় করিয়া নিজেও বড় হইয়াছেন।

তাঁহার রামচন্দ্রও মহাভক্ত রাবণের বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া লক্ষণ প্রভৃতিকে বলিতেছেন :

"হের রে তূণীরে মম—কাল-সর্পাকৃতি-শর ;
শূল, চক্র, পাশ, দণ্ড আদি মহা-অস্ত্র
কি আছে জগতে—
বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড-প্রভাবে ?
কিন্তু, তথাপি নারি বিনাশিতে দশাননে !
তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর !"

পৌরাণিক চরিত্রের এই অপূর্ব্ব চিত্র শুধু যে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল, তাহা নহে ; সেই সঙ্গে তখনকার নট-নেতৃরূপে পরিচিত গিরিশচন্দ্রকে বঙ্গবিখ্যাত নাট্যকারের পদে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সময়কার দুইজন স্বাধীনচেতা সমঝদার লেখকের লেখায় তাহার প্রমাণও আছে। 'সাধারণী'তে অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"এত দিনে বাঙ্গালায় প্রকৃত পৌরাণিক নাটকের সৃষ্টি হইল।----নাটক-নামাঙ্কিত যে অসংখ্য পুস্তিকা বাঙ্গালায় আছে, তাহার মধ্যে ৪।৫ খানি প্রহসন এবং ৪।৫ খানি সাময়িক ছবি ব্যতীত প্রায় সকলগুলিই সাধারণ নাটক নামের অযোগ্য বলিলেও চলে। পৌরাণিক নাটক-নামধেয় গ্রন্থেরও অভাব নাই। সর্ব্বত্রই সমান বিড়ম্বনা। নাটককারেরা জগতের অতুল্য কবিদ্বয় বাল্মীকি-ব্যাসের জীবন্ত সৃষ্টজীব লইয়া এমনই বিকৃত করিয়া তুলেন যে, পড়িতে লজ্জা বোধ হয় ; বীররসের সহিত বীভৎস, করুণাতে হাস্য, আদিরসের সহিত ভয়ানক ভাব—এইরূপ অবিরত প্রজাপতি-শরীরে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া—ক্রমাগত রসভঙ্গ করিতে থাকেন যে, তাহাতে কখনই কোন রসের স্ফূর্ত্তি ও পূর্ত্তি হয় না, কেবল কবিকুলগুরু-দিগের অবমাননা হয়।----আজি গিরিশচন্দ্র হইতে প্রকৃত পৌরাণিক নাটকের সৃষ্টি হইল। গিরিশচন্দ্র নাটকের লক্ষণা-ব্যঞ্জনা বিলক্ষণ জানেন, কোথায় কোন্ ভাব সাজে—না সাজে, কোথায় কোন্ কথা লাগে—না লাগে, গিরিশ বাবু যেমন বুঝেন, অতি অল্প লোকেই তেমন বুঝিতে পারেন ; আর তিনি অতি নিগূঢ় চরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারেন ; অভিনয়-মঞ্চে এই দেখিলাম—গিরিশ কোমল-দেহে, কোমল-ভাবে, প্রশান্ত-গম্ভীর-মূর্ত্তিতে রাম-রূপে লোক মোহন করিতেছেন, পরক্ষণেই দেখি—সেই গিরিশ উজ্জ্বল, উগ্র, উদ্ধত মূর্ত্তিতে মেঘনাদ-রূপে লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলের

বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন! এরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য কল্পনায় আয়ত্ত করা গিরিশেই সম্ভব, কেন-না গিরিশ অসাধারণ নটনিপুণ।" গিরিশচন্দ্রের এই কল্পনা-শক্তির জয় ঘোষণা করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার 'ভারতী'তে তখন লিখিয়াছিলেন,—"একখণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্য্যের আলোক ত প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু একখণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্য-গুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক-খণ্ড, এবং তাঁহার রাবণ-বধ ও অভিমন্যু-বধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ।"

এইবার গিরিশচন্দ্রের হিরণ্যকশিপু-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শত্রুকে ভগবান্ জানিয়াও রাবণ তাঁহার প্রতি যেরূপ বৈর-ভাবে নিজের চিত্তকে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেরূপ বৈর-ভাব হিরণ্যকশিপুতে দেখা যায় না। হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে তাঁহার প্রধান ও প্রবল শত্রু ভিন্ন আর কখনও কিছু ভাবেন নাই। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, দেবর্ষি নারদের মুখে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক অগ্রজের নিধন-প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া তিনি তাহার প্রতিশোধ-আকাঙ্খায় অধীর হইয়া পুত্র প্রহ্লাদকে বলিতেছেন :

"প্রহ্লাদ, বসি' তুই দৈত্য-সিংহাসনে,
পারিবি অমরগণে করিতে শাসন ?
আমি যাই হরি-অন্বেষণে।"

এই কথা শুনিয়া পুত্র বলিল :

"পিতা, আমি যাব সাথে,
তব পদাশ্রয়ে হরির দর্শন পাব।"

প্রহ্লাদের এই বাক্যে, অনেকে হয়ত ভাবিতেছেন, হিরণ্যকশিপু এবার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রহ্লাদ-পীড়নে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহা করিলে হয়ত নাটকের গল্পাংশের দিক্ দিয়া তেমন কিছু ক্ষতি হইত না, কিন্তু তাহাতে হিরণ্যকশিপু-চরিত্র অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট হইত। হরি-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু আত্মজের কথায় যেন নিজেরই মনোভাবের ছায়া দেখিতে পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে দেবর্ষিকে তখন বলিলেন :

"দেখ ঋষি, দৈত্য-পুত্র নাহি-গণে অরি ;
শিশু চায় হরি-সন্মুখীন হ'তে।"

ইহার পরই প্রহ্লাদের মুখে তিনি যখন শুনিলেন—

"হরি কার অরি ?
নামে যাঁর অতুল মাধুরী,
বাঁশরী-বদন ভক্ত-জন-হৃদয়-রঞ্জন,
মদনমোহন শ্যাম ; হরি কারু নহে অরি।"

তখন তাঁহার হরি-বিদ্বেষ আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। যে হরি তাঁহার অগ্রজের প্রাণ-হন্তা, সেই হরিকে তাঁহারই পুত্র প্রাণ-মন ঢালিয়া ভালবাসিতেছে,—ইহার চেয়ে মর্ম্মান্তিক ঘটনা আর কি হইতে পারে ? এই দুই ঘটনাই এ নাটকের প্রাণ। এই দুই ঘটনার সন্তাপে অহরহঃ পুড়িতে পুড়িতে হিরণ্যকশিপু তাঁহার শত্রু-চিন্তায় কিরূপ তন্ময়তা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কবি তাহা পর্দ্দায় পর্দ্দায় খুলিয়া যে ভাবে দেখাইয়াছেন, সে নাট্যনিপুণতা বাস্তবিক আর কোথাও দেখি নাই। সে তন্ময়তার চরম রূপ নাটকের শেষাঙ্কের যে দৃশ্যে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই একস্থানে হিরণ্যকশিপু তাঁহার মন্ত্রীকে বলিতেছেন :

"মন্ত্রী, ত্রিসংসার হেরি হরিময়,
নিশিদিনে শয়নে স্বপনে,
হরি নাহি ভুলি,
কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল,
হরি না আইল ;
রাজ্যধন বিফল সকলি,
প্রতিশোধ দিতে যদি নারি।"

ইহা শুধু হিরণ্যকশিপুর মুখের কথা নয়। নাটকে দেখিতে পাই, গভীর নিশীথে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া হরিকে খুঁজিতেছেন, আপন-মনে বলিতেছেন,—"চুপ! কথা কওয়াও উচিত নয়, দুরাচার পালাবে, ঐ হরি আস্‌ছে। হা ভ্রাতঃ! বরাহ-দন্তে তোমার অঙ্গ বিদীর্ণ হ'য়েছে ; বীরবর, ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি বরাহ-নিধন করছি! কি বল মন্ত্রী! প্রহ্লাদ কালী ব'লেছে, দুরাচার হরিনাম আর নেয় না ? আমার পুত্র, আমার পুত্র, আমার,—চুপ, চুপ! ঐ হরি আস্‌ছে।"

বাস্তবিক, হরিকে দেখিবার জন্য প্রহ্লাদ বেশী ব্যাকুল কি হিরণ্যকশিপু বেশী ব্যাকুল, তাহা নাটক পড়িয়া নির্ণয় করা কঠিন। এ গুণপনা আর কোথাও কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি ?

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটক-সম্বন্ধে এখানে আরও একটি কথা বলিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিব। অনেকের ধারণা, গ্রন্থ-শেষে এক বা একাধিক বিশিষ্ট চরিত্রের মৃত্যু থাকিলে, তাহা 'ট্র্যাজেডি' হয়। এ দিকে আবার সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নাট্য-গ্রন্থের উপসংহারে মৃত্যু থাকিবার জো নাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জনা, নসীরাম, প্রহ্লাদ-চরিত্র, কালাপাহাড় প্রভৃতি নাটকগুলির প্রত্যেকখানিতেই মৃত্যু আছে, অথচ ইহাদের কোনখানিকেই 'ট্র্যাজেডি' নামে অভিহিত করা যায় না। 'জনা' নাটকে প্রবীর মরিয়াছে, মদনমঞ্জরী মরিয়াছে, শেষে জনাও গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইয়াছে; তবু গিরিশচন্দ্র ইহাকে 'ট্র্যাজেডি' করেন নাই।—নাটকের সর্ব্বশেষে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজ রাজাকে 'দেবদৃষ্টি দান' করিয়া বলিতেছেন :

"হের মতিমান্,
ওই পুত্র, পুত্রবধূ তব
ভীষণ তুষারাবৃত কৈলাস-শিখরে,
বিল্বদলে জবাফুলে
পূজিছে পার্ব্বতী-হরে ;
নাহি মনে মর্ত্ত্যের বারতা।
হের, দুগ্ধময়ী সলিল-মাঝারে
মকরবাহিনী ভাগীরথী ;
হের, জনা প্রসন্নবদনা
চামর ঢুলায় পাশে,
নহে আর পুত্র-শোকে উন্মাদিনী।
প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ, মন কর স্থির।"

ইহা দেখিয়া নীলধ্বজ বলিলেন

"অজ্ঞান-তিমির-বিনাশন,
জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন !"

এইখানেই নাটকের 'যবনিকা' পড়িয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত কয়খানি নাটকেরই শেষভাগে কতকটা ঐ ভাবেরই চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকের এই প্রকার পরিসমাপ্তি অনেকে পছন্দ করেন না। কেহ কেহ এ জিনিষটাকে গিরিশ-নাটকের একটা প্রকাণ্ড দোষ মনে করিয়া অভিনয়-কালে উহা বর্জন করিয়াও থাকেন। কিন্তু তাহাতে অভিনয় জমে

কিনা, বলিতে পারি না। তবে রসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে উহা যে নাটকের অঙ্গহানি করে, এ কথা নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজা ও রাণী' নাট্য-গ্রন্থের ত্রুটি-সম্বন্ধে যেমন নিজেই বলিয়াছেন,—"এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু-দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েচে—এই মৃত্যু আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম নয়।"—সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, গিরিশের ঐ সব নাটকের অন্তিমে যদি শোক-দুঃখের দীর্ঘশ্বাস-দ্বারা 'চমৎকার' উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পাইত, তবে তাহা আখ্যান-ধারার অনিবার্য্য পরিণাম হইত না ; কারণ, ঐ সব আখ্যানধারার মূল কথা ভক্তি-সাধনের সার্থকতা। মনে রাখিতে হইবে, ভক্তির পথ রসের পথ। বাঙ্গালার ভক্তি-সাধন বহুদিন হইতেই এই রসের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। এই পথে সর্ব্বপ্রকার অন্তর্দাহের অবসান যদি অন্তিমে না ঘটে, তবে তাহা রস-বিপর্য্যয়-দোষ ছাড়া আর কিছু হইবে না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে কয়টি রসের কথা আছে, সে সমস্ত প্রকার রসেরই প্রকৃত ও পরিস্ফুট চিত্র 'জনা' নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃতিত্ব অন্য কোনও একখানি নাটকে আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন, এমন কথা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। কিন্তু সর্ব্বরসের সমাবেশ থাকিলেও এই নাটকে যে কয়টি প্রধান চরিত্র আছে, তাহারা সকলেই পরম ভক্ত। নীলধ্বজ, বিদূষক, অগ্নি, ভীম, অর্জুন, বৃষকেতু প্রভৃতির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য যথেষ্ট থাকিলেও ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। প্রবীর কৃষ্ণ-ভক্ত না হইলেও মাতৃচরণকে জীবনের গতি-মুক্তির উপায় মনে করিতেন। জনার উপাস্য জাহ্নবী—জাহ্নবীর অঙ্কদেশে আশ্রয়-লাভই তাঁহার জীবনের আকিঞ্চন। আর, স্বাহা ও মদনমঞ্জরী, ইঁহারা উভয়ই 'পতিমাত্র সার অবলার' ছাড়া অন্য কিছু জানিতেন না। এই সব ভক্তি-প্রাণ নর-নারীর ভক্তি-সাধনকে সার্থক করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণ এই নাটকের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সুতরাং স্থায়ী শান্তিরতি ভিন্ন অন্য কিছু ইহার শেষ দর্শনীয় হইতে পারে না। গিরিশচন্দ্র তাহাই দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া উহা তাঁহার নাট্যকলার একটি বড় রকম বিশেষত্ব হইয়াছে, মনে করি। তিনি নিজেও তাঁহার একটি প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন, "মানব-হৃদয় স্পর্শ করা কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভিন্ন দেশে তাহার আকার কতক পরিমাণে ভিন্ন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে দেশভেদে বিভিন্নতা। সেক্সপিয়রের 'টেম্‌পেষ্ট' নাটকের সহিত কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের বারবার তুলনা হইয়া থাকে। 'টেম্‌পেষ্ট' বায়ুবিহারী দেহী- ও কুহক-আশ্রয়ে রচিত। 'শকুন্তলা'—ঋষির অভিশাপ ও অপ্সরার

প্রণয়-ভিত্তির উপর স্থাপিত। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করা যায় যে, ভিন্ন দেশে ভিন্ন মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক ভিন্ন ভাবাপন্নই হইয়া থাকে ; এবং এক দেশেই সময়বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়।"—গিরিশচন্দ্রের এই মূল্যবান্ উক্তি মনে রাখিয়া যিনি গিরিশ-নাট্যকলার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার নিকট উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্যকলার একটা জোড়া-তাড়া-দেওয়া জিনিষ বলিয়া বোধ হইবে না। বীণাপাণির হাতে বীণার বিনিময়ে হার্প্ দিলে নূতন রকম হয় বটে, কিন্তু তাহা শোভন ও সঙ্গত হয় না। গিরিশচন্দ্র কখনও তাহা করেন নাই। ভারতীয় চিত্রকলা যেমন দেশের মূল-মর্ম্মস্থানটিকে আশ্রয় করিয়া, তাহারই ভাব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্য দেশের চিত্রকলা হইতে স্বতন্ত্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, গিরিশের নাট্যকলাও সেই ভাবে স্বতন্ত্র বিকশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার কোনও এক রচনার একস্থলে বলিয়াছিলেন, "স্রষ্টাকে না জানিলে তাঁর স্মৃষ্টির সকল রহস্য-ভেদ ও সকল রস-ভোগ সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের স্মৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে, তাঁহাদের স্মৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল রহস্য ভেদ ও সকল রস সম্ভোগ করা যায় না।"—বিপিনবাবুর এই উক্তি যে অতি সত্য, তাহা গিরিশচন্দ্রের নাট্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। অবশ্য, যে সাহিত্য খোশ্‌খেয়ালে বা অনুচিকীর্ষার বশে রচিত, সে সাহিত্যকে স্মৃষ্টি এবং তাহার লেখককে স্রষ্টা মনে করিয়া যদি বিপিনবাবুর বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে বিচার-বিভ্রাটই ঘটিবার ষোলআনা সম্ভাবনা। বলিতে কি, আমাদের সমালোচন-সাহিত্যে সেইরূপ বিচার-বিভ্রাটের পরিচয় কিছু বেশী রকম দেখা যায়। বিদেশী কোনও এক কবির ভাব ও কল্পনা আমাদের দেশের কোনও এক লেখকের লেখায় প্রতিবিম্বিত দেখিলেই আমরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই বিদেশী কবির জীবনের ও কাব্যের যোগসূত্রটুকু বিদেশী সমালোচনা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাই এ দেশের লেখকের জীবনে জোর করিয়া জড়াইয়া দিই। তাহাতে কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, বলিতে পারি না ; কিন্তু সে সমালোচনা যে সত্য হয় না, তাহা স্থির নিশ্চিত। দেখিতে পাই, যে বৎসরে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক রচিত হয়, সেই ১২৯৩ সালেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এ দেশের এক শ্রেণীর কবির উদ্দেশে দুঃখ করিয়া তাঁহার 'নবজীবন' মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"শেলি, শেলি, শেলি,—কেবল শেলির দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিব্যক্ত অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি নষ্ট করিবে ? বায়রন-সম্প্রদায়ের জীবন্ত জলন্ত প্রতিমায় শেলি-সম্প্রদায় শেড্ লাগাইয়াছেন বলিয়াই শেলি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব। একবার বায়রন-সম্প্রদায়ের জলন্ত মূর্ত্তি উঠাইয়া লও, দেখিবে বিলাতের উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত ছায়াময় কাব্য অতলের অতলে ডুবিয়া যাইবে। ধূপছায়ায় ধূপের গুণেই ছায়ার আদর। তোমরা ছায়া—তোমাদের ধূপ কি ? ছায়া—কিসের ছায়া ? বায়রনের ছায়া শেলি। শেলির ছায়া হইবে ? একে ছায়ার ছায়া, তাহাতে বিদেশের ছায়া—এ দেশে লাগিবে কেন ?" বলা বাহুল্য, এরূপ ক্ষোভ-প্রকাশ

গিরিশচন্দ্রের লেখা পড়িয়া কাহাকেও কখনও করিতে হয় নাই। উর্ণনাভ যেমন নিজের স্ফটিকা নির্গত করিয়া তাহার দ্বারা সুন্দর লূতাতন্তু নির্ম্মাণ করে, বড় বড় কবিরাও তেমনি আপন-আপন অনুভূতি- ও অভিজ্ঞতা-অবলম্বনে তাঁহাদের সাহিত্যকে গড়িয়া তোলেন। গিরিশচন্দ্রের স্বষ্ট সাহিত্যও তাঁহার নিজ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই ভিত্তির খবর আমরা অনেকেই জানি না বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহার স্বষ্ট চরিত্রের মর্ম্ম ও তাঁহার নাট্যগত সৌন্দর্য্যের মহিমা ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেই জন্য তাঁহার 'পাগলিনী'কে কেহ প্রহেলিকা ও তাঁহার 'জগমণি'কে কেহ অস্বাভাবিক মনে করেন ; কেহ তাঁহার ভাষার ও ছন্দের নিন্দা করেন ; আর কেহ-বা তাঁহার বিল্বমঙ্গল নাটকের 'বণিক্ ও বণিক্-পত্নী'র উপাখ্যানটুকুকে উদ্ভটতার উদাহরণ মনে করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া থাকেন। কাজেই গিরিশ-প্রকৃতি-সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"প্রকৃতি ছয় প্রকার জাতিগত, বংশগত, দেশগত, কালগত, বয়ঃক্রমগত ও প্রত্যেকের আত্মগত। এইরূপে প্রত্যেক পুরুষের বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহ তাহার জাতি, বংশ, দেশ, কাল, বয়স ও আত্মগুণানুসারে তদনুরূপ হইয়া থাকে।"* মানুষকে চিনিবার ও তাহার কার্য্য-পদ্ধতি বুঝিবার পক্ষে এমন সংক্ষিপ্ত অথচ এমন সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নির্দ্দেশ-অনুসারে যদি সাহিত্য-স্রষ্টাদিগকে চিনিবার আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বষ্ট সাহিত্যের অনেক রহস্যই জানিতে পারিব। সাহিত্য-সাগরে কেমন করিয়া কোন্ ভাব-তরঙ্গ নূতন আকারে দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ-নির্ণয় করিতে দেশের ইতিহাস পারে না। শুদ্ধ কালগত প্রভাব-সাহায্যেও তাহার কারণ ঠিক ধরা যায় না। সাহিত্যের স্বষ্টি যাঁহারা করেন, তাঁহাদের ঐ ছয় প্রকার প্রকৃতিই কেবল তাহার সকল নিদান নিরূপণ করিতে পারে। কিন্তু গিরিশ-জীবনের সমস্ত কথা ধরিয়া তাঁহার স্বষ্ট সাহিত্যের সকল রকম বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া বলিবার এখানে অবসর হইবে না। অত সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের এখানে তেমন প্রয়োজনও নাই। জীবনের যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার গুণে তিনি তাঁহার নাটকগুলিতে নানা গুণপনা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই একটু আলোচনা এ ক্ষেত্রে করিব।

---

* তত্র প্রকৃতির্জাতি-প্রসক্তা কুলপ্রসক্তা চ দেশানুপাতিনী চ কালানুপাতিনী চ বয়োঽনুপাতিনী চ প্রত্যাত্মনিয়তা চেতি। এতাবজ্জাতি-কুল-দেশ-কাল-বয়ঃ-প্রত্যাত্মনিয়তা হি তেষাং তেষাং পুরুষাণাং তে তে ভাববিশেষা ভবন্তি।

—ইন্দ্রিয়স্থান, চরক-সংহিতা।

মনে রাখিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ের লোক, গিরিশচন্দ্রও সেই সময়ের লোক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র হইতে বয়সে পাঁচ বৎসরের ছোট এবং নবীনচন্দ্রের চেয়ে তিন বৎসরের বড় ছিলেন। অথচ বঙ্কিম, হেম ও নবীন যে ভাব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কাব্য-উপন্যাসাদি লিখিয়াছিলেন, সে ভাব-প্রভাব গিরিশের সাহিত্যে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পাঁচকড়িবাবু বলিয়াছেন,—"বঙ্কিম-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য কোম্‌ৎ-তন্ত্রের ভাবে ও সিদ্ধান্তে যেন ওতপ্রোতভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিল।"* কিন্তু গিরিশচন্দ্র বঙ্কিম-যুগের লোক বলিয়া তাঁহার স্বষ্ট সাহিত্য-সম্বন্ধেও ঐরূপ ধারণা করিয়া বসিলে বিষম ভুল হইবে। গিরিশচন্দ্র নিজের কথা নিজেই প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'নাট্যকার' নামক প্রবন্ধের একস্থলে আছে,—"যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে।" —ইহা যে গিরিশচন্দ্র করিতে পারিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার নাটক পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কি গুণে, কি প্রকারে তাহা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এ কথা, তাঁহার নট-জীবনের সাধনার কথা না জানিলে, বুঝা যাইবে না।

বাস্তবিক, প্রথমে তিনি অভিনেতা হইয়া রঙ্গালয়ে যোগ না দিলে, দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার চিন্তা দূরে যাউক, নাট্য-রচনার প্রবৃত্তিই তাঁহার মনে কখনও জাগিত কি-না, সন্দেহের বিষয়। ১২৮৫ সালে বঙ্গদেশে ৩৯৮ খানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়; তাহার মধ্যে ৯৪খানি ছিল নাটক-নামাঙ্কিত পুস্তক। কিন্তু এই সব নাটকের উদ্দেশে 'সাধারণী' পত্রিকা তখন লিখিয়াছিল, —"সাধারণত আজিকালিকার বঙ্গভাষার নাটক অশ্রাব্য, অপঠনীয়—মূর্ত্তি দেখিলে হাসি পায়, দুঃখও হয়।"—নাটকের এই শোচনীয় অবস্থাই গিরিশ চন্দ্রকে নাটক-রচনা-কার্য্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বঙ্গ-রঙ্গালয়েরও তখন অতি শৈশবাবস্থা। নট-নেতার আসনে বসিয়া গিরিশ দেখিলেন যে, এ সময়ে অভিনয়োপযোগী নূতন নূতন নাটক যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে থিয়েটারের জীবন-রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে। তাই বাধ্য হইয়া নাটক লিখিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন।

---

* অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত "মহাপূজা" গ্রন্থের ভূমিকা।

ইহার পূর্ব্বে তিনি 'মেঘনাদ-বধ কাব্য', দুর্গেশনন্দিনী,' 'মৃণালিনী,' 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতিকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া রঙ্গমঞ্চে তাহাদের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং নবীনচন্দ্র তাঁহাকে বলেন,—"আপনি ধারাপাতকেও নাটক করিতে পারেন।"—নবীনচন্দ্রের এই উক্তি যে আনন্দের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, অসত্য নহে, তাহা গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য' নাটক যিনি একটু লক্ষ্য করিয়া পড়িবেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে। মূর্ত্তিমান্ বেদান্তকে নাটকীয় দেহে নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত করিয়া প্রকাশ করা, বোধ করি, ধারাপাতকে নাটক করা অপেক্ষা সহজ কার্য্য নহে। কিন্তু এ কার্য্য শুধু কবি-প্রতিভার দ্বারা সম্পন্ন হয় না। ইহার মূলে অভিনয়-সাধন-লব্ধ অভিজ্ঞতা থাকা চাই। পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতিকে নাটকাকারে পরিণত করিবার সময় গিরিশচন্দ্র তাঁহার সেই গুণেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার নট-সাধনার স্বরূপটুকু বুঝিবার জন্য এখানে কিছু বলা আবশ্যক।

কথাটাকে একটু বিশদ করিবার জন্য নটরাজ অমৃতলাল বসুর একখানি অপ্রকাশিত পত্র, যাহা তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে গিরিশ-চন্দ্রকেই লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গিরিশ-চন্দ্র তখন কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। অমৃতলাল কলিকাতা হইতে তাঁহাকে লিখেন,—"চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল আপনার যে পূজনীয় চরণ-প্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আসিতেছিলাম, আজ দুই-বৎসর সেই চরণদ্বয় ধ্যানে হৃদয়ে রাখিয়া বিজয়ার সন্ধ্যায় তদুপরি আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ-সিক্ত আমার দীন মস্তক অবনত করিতে হইতেছে।---প্রথম যৌবনে যে সমস্ত সোদরাধিক স্নেহপ্রবণ নাট্য-সঙ্গী পাইয়াছিলাম, যাহাদের সহিত বিজয়ার পর বিজয়ার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া আলিঙ্গন করিতাম, ক্রমে ক্রমে তাহারা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছে। আমার পুত্রপরিবারাদি আছে বটে, কিন্তু নাট্য-শালাতেই আগে সংসার পাতিয়াছিলাম; স্নেহ-আদরের—রোষ-অভিমানের আদানপ্রদান কৈশোরের অমলপ্রাণ প্রথমে নাট্য-বন্ধুদের সঙ্গেই করিয়াছিল। তাই আজ এই প্রাচীন বয়সে আমার এ সংসারে বড় একা একা মনে হয়। তবু বিশ্বনাথের চরণ-কৃপায় এখনও এই মহাসুখ যে, নিকটে হউক, দূরে হউক, আমার সহায় হইতে, আমার বিপদে দেখিতে, পদ-স্খলনে সাবধান করিতে, সংশয়ে ভ্রান্তি ঘুচাইতে আপনি এখনও জীবিত আছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করুন। আপনার অতুল প্রতিভা ও প্রকৃতি-সিদ্ধ আত্মশক্তি এবং আমার সযত্ন সেবা বঙ্গীয় নাট্যশালাকে অবজ্ঞার পদাসন হইতে

যে গৌরবের সিংহাসনে তুলিয়াছিল, সে সিংহাসন টলমল করিতেছে; বর্ত্তমান নটকুল আপনার মাথা আপনি কাটিতেছে, 'শিক্ষিত' বঙ্গীয় দর্শককুল তালি বাজাইয়া সেই মস্তক ভক্ষণ করিতেছেন, আর দিগ্বিজয়ী নাট্যকারগণ নিত্য নূতন ছুঁচোবাজি ছাড়িয়া রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিতেছেন। এ সময়ে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ রঙ্গভূমির পক্ষে অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল।"*

গুরুর পরিচয় শিষ্যে, শিষ্যের পরিচয় গুরুতে। অমৃতলালের উপরি-উদ্ধৃত পত্রখানিতে ঐ দুয়েরই পরিচয়, অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও, অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। কি প্রবল ও প্রগাঢ় নাট্যানুরাগ লইয়া তাঁহারা নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও ঐ পত্র-মধ্যে সুপ্রকাশ। সংসারে প্রতিভা ও পুরুষকার যতই প্রবল হউক না, ঐরূপ অনুরক্তির সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহা কখনই কোনও বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার বৃহৎ সদনুষ্ঠানেরই সিদ্ধি ঐ তিন প্রকার গুণের শুভ যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। ঐ তিন গুণ সাধনা-লব্ধ নহে, আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় উহাদিগকে 'আত্মগুণ' বলা যাইতে পারে। গিরিশ-জীবনে ঐ তিন গুণেরই আমরা সমান সমাবেশ দেখিতে পাই। তিনি যে নানা প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে কখনও দিশেহারা না হইয়া এ দেশে একে একে কয়েকটি থিয়েটার-সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত অভিনব অভিনয়-বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তিনি যে বহু উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার ঐ আত্মগত গুণগুলিই তাহার নিগূঢ় হেতু।

একটা নূতন কিছু করিতে হইবে, এই মনে করিয়াই যে তিনি এ দেশে অভিনয়-কলায় নূতন রূপ দিয়াছিলেন, তাহা কেহ ভাবিবেন না; তাহা হইলে তাহার আয়ু শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইত। উহার মূলেও তাঁহার দেশীয় ভাব-অনুপ্রাণনার সুস্পষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বে এ দেশের যাঁহারা অভিনয় করিতেন, তাঁহাদের অভিনয়কে কতকটা ছায়ার ছায়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অভিনয় জিনিষটা লোক-স্বভাবেরই অনুসরণ বা অনুকরণ। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনেতারা লোক-স্বভাবের তেমন অনুকরণ চেষ্টা না করিয়া বিলাতী অভিনয়ের অনুকরণ,—অর্থাৎ অনুকরণেরই কতকটা অনুসরণ

* অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই পত্রখানি পাইয়াছি।

করিতেন। সে অভিনয়-ভঙ্গী কেমন ছিল, তাহার একটু পরিচয় দিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—"আমার স্মরণ আছে, বেলগাছিয়ায় 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখিয়া একব্যক্তি প্রশংসা করিতেছেন—'কি চমৎকার ব্যাপার! রাজার গলায় প্রকৃত মুক্তার মালা, পশ্চাতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে শুনিয়া রাজা সাগরিকাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিলেন, একজন রাজভক্ত সভয়ে তাঁহাকে বাধা দিল। তিনি বাধা উপেক্ষা করিয়া ছুটিলেন, অমন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গেল, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না।'—কাব্যের প্রশংসা নাই, অভিনেতার বক্তৃতায় কিরূপ হৃদয় দ্রব হইয়াছিল—তাহা নাই, কোনও সরস পঙ্ক্তির আবৃত্তি নাই,—কেবল মুক্তার মালা, সাজ-সরঞ্জামের প্রশংসা! এই শ্রেণীর সমালোচক প্রথমে যাত্রার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করেন, ইহাতে ক্ষতি-লাভ উভয়ই হইল। যাত্রার কতকগুলা অশ্লীল ভাঁড়ামি ছিল—তাহা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারীর মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোতও লোপ পাইল।---অভিনয় সভ্যভাবে সভ্যকথায় চলিতে লাগিল। রসের উদ্ভব যত হোক বা না হোক, সভ্যতাই ইহার প্রশংসা।"

অভিনয়-কলার এইরূপ দুর্দ্দশার দিনেই গিরিশচন্দ্র অভিনয়ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া দেশীয় লোক-স্বভাবের অনুসরণে বাঙ্গালার অভিনয়-কলায় নব রূপের প্রবর্ত্তন করেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র-আলোচনা-প্রসঙ্গে "The Mirror of Gesture" নামক গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক তাঁহার ভূমিকার একস্থানে লিখিয়াছেন,—"Indian acting is a poetic art, an interpretation of life, while modern European acting, apart from any question of the words, is prose, or imitation."

গিরিশ-প্রবর্ত্তিত অভিনয়-প্রণালীতে এই "poetic art"ই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রথম-জীবনে 'নিমেদত্ত', 'ভীমসিংহ' 'দক্ষ,' 'রামচন্দ্র,' 'ইন্দ্রজিৎ' ও 'পশুপতি' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ-জীবনে 'যোগেশ', 'করুণাময়,' 'মাধাই,', 'বিদূষক' 'কঞ্চুকী' প্রভৃতি প্রায় ৬২ রকমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে অপূর্ব্ব অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা poetic art-এরই পরম পরিচয়। এই অভিনয়ের সমস্ত কথা ধরিয়া যদি কেহ বিচার-বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক তাহার আলোচনা করেন, তাহা হইলে সে আলোচনা অভিনয়-প্রিয় পাঠকমাত্রেরই পরম আদরের সমগ্রী হইবে। বলা বাহুল্য, অত কথা বলিবার এখানে আমাদের অবসর নাই, এবং তাহা ঠিক প্রাসঙ্গিকও হইবে না। তাঁহার নাট্যসাহিত্যের মূর্ত্তি-সংগঠন-ব্যাপারে তাঁহার

নট-জীবনের সাধনা ও অভিজ্ঞতা কি ভাবে কি কি কাজ করিয়াছিল, শুধু সেই-টুকুই সংক্ষেপে বিবৃত করা আমার উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,—"নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, আমার নাটকের যদি অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়া-কপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই।"—কিন্তু এই কথা মনে করিয়া নাটক-রচনা করা নটগুরু গিরিশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল; কেন-না, অভিনয়ের সফলতা ও নিষ্ফলতার উপরেই থিয়েটার জিনিষটার জীবন-মরণ প্রধানতঃ নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের কর্ণধার ছিলেন। থিয়েটারের জীবন-রক্ষার জন্যই নাটক লিখিতে তিনি প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহার লিখিত নাটকাবলীর 'ভাবখানা' যাহা হইবার কথা, তাহা এইরূপ যে,—'অভিনয়ের ভিতর দিয়া আমরা যদি রসে ভরিয়া, রূপে ফুটিয়া দর্শককুলের মনে আনন্দ দান করিতে পারি, তবেই আমাদের নাটক-জীবন সার্থক; নহিলে আমাদেরই পোড়া-কপাল।' কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অভিনয়ের মুখ-তাকাইয়া নাটক লিখিতে গেলে নাট্যাংশে উহা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের ধারণা, উহা অক্ষমতার পক্ষ লইয়া ওকালতি করা ছাড়া আর কিছু নহে। মনে রাখা চাই,—নাটক অভিনেয় কাব্য। নানা গুণ-সত্ত্বেও উহা যদি অভিনয়োপ-যোগিতা-গুণ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহাকে নাট্যাংশে দুর্ব্বল বলিয়াই মনে করিতে হইবে। নাটকের সহিত অভিনয়ের এবং অভিনয়ের সহিত নাটকের সম্বন্ধ স্বতঃ সংশ্লিষ্ট। একের ত্রুটিতে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক সময়েই হইয়া থাকে।

এই ত্রুটি যাহাতে না ঘটে, তাহারই উপায়-স্বরূপ গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত অভিনয়-প্রণালীর সহিত তাঁহার রচিত নাটকের রীতি-প্রকৃতিকে এক সুরে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সে চেষ্টা কিরূপ সফল হইয়াছিল, তাহাই এখানে একটু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়াস পাইব।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"স্বভাব আমাদের কথা কহিবার জন্য ছন্দ দিয়াছেন ও ভাব-প্রকাশের জন্য সুর দিয়াছেন। সমস্ত কথাই ছন্দে, সমস্ত ভাবই সুরে গ্রথিত হয়, এবং ছন্দ ও সুর কলাবিদ্যা-বলে সুন্দররূপে পর পর সজ্জিত হইয়া কবিতার ছটা হয় ও গানের সুর হয়; আর নট ভাব-প্রকাশক সুরেই কথা কহিয়া থাকেন।----তবে সুর বেশীমাত্রায় করিলে তাহা ঢং হয়।"—আমাদের দেশের যাত্রায় সুরের মাত্রা বেশীই ছিল, এবং গিরিশের পূর্ব্বে যাঁহারা থিয়েটারে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিনয়ে উহা প্রায় লোপ

পাইয়াছিল। যথাযোগ্য ভাবপ্রকাশক সুরে অভিনয় করিবার রীতি গিরিশ-কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যে স্থানে ভাষা ভাবের আবেগে আপনা-আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চায়, বাঙ্গালা নাটকে সে স্থানের ভাষা অনেক সময় ছন্দে লিখিত হইলেও তাহা নাটকের উপযোগী হইত না। এ জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে তাহারই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; তদন্যথায় রঙ্গভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ, বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"—এইরূপ হাস্যাস্পদ হইবার হাত হইতে নট-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র ১২৮৮ সালে তাঁহার 'রাবণ বধ' নাটকে এক নূতন ধরণের ছন্দের আমদানি করেন। এই ছন্দ যে শুধু নটের আবৃত্তিকে সুমিষ্ট করিবার পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল, তাহা নহে;—নাটকীয় ভাষা-হিসাবে নাটকেরও উহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের 'মঙ্গলাচরণে' বলেন,—"অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।" কথাটা ঠিকও বটে, বে-ঠিকও বটে। 'অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য' সত্য, কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পদ্য যে নাটকের উপযুক্ত নহে, এ কথা গিরিশচন্দ্র অভিনেতৃ-জীবনের অভিজ্ঞতা-ফলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কবিবর নবীনচন্দ্রকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন:—"চৌদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না।

> 'বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে।'

এইরূপ হামেসাই হবে। বাঙ্গলা-ভাষার ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু 'গৈরিশ-ছন্দে' সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হইতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠিবে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন।"

এই প্রয়োজনের কথা তখনকার দিনে অনেক সাহিত্যিকই বুঝেন নাই;—অনেক লেখকই ঐ ছন্দের নিন্দা করিয়াছিলেন। তবে যাঁহাদের লইয়া থিয়েটার—অর্থাৎ, অভিনেতা ও দর্শক, এই দুই দলেরই উহা 'মনোরঞ্জন

করিতে ' সমর্থ হইয়াছিল। আর সেই সময়ে 'ভারতী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'সাধারণী'তে অক্ষয়চন্দ্র সরকার—শুধু এই দুইজন সাহিত্য-রথী গিরিশের এই ভাষাকে মাইকেলের ভাষার চেয়ে উচ্চাসন দিয়াছিলেন। অক্ষয়-চন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"মধুসূদন যাহা না বুঝিয়া অনর্থপাত করিয়াছেন, হেমচন্দ্র যাহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না, অনেকে যাহা কাণে বুঝেন, অথচ মনে বুঝেন না, ভরসা হয় গিরিশচন্দ্র তাহা বুঝিয়াছেন। সাধারণতঃ বাঙ্গালার যতি, দুই চারি ছয় বা আটমাত্রার পর হইয়া থাকে। তোটক, একাবলী প্রভৃতি গুটিকত লঘুগতি ছন্দে এই নিয়মের ব্যভিচার হইলেও, সাধারণতঃ এক, তিন, পাঁচ, সাত প্রভৃতি মাত্রার পর যতিপাত হয় না। গিরিশচন্দ্রের নাটকের কোথাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার নাই। - - - - অথচ মাত্রার এতই বৈষম্য আছে যে, অনেক সময়ে গদ্য বলিয়া বোধ হয়। গদ্য-পদ্যের এইরূপ সমভাব-করণ দ্বারা ভাষা সম্পূর্ণ নাটকের উপযোগিনী হইয়াছে। ইহাতে গদ্যের নীরসতা নাই, প্রবাহ আছে; পদ্যের সমমাত্রা বৃত্তি বা একঘেয়ে ভাব নাই, অথচ মিষ্টতা আছে। তাহাতেই বলিয়াছি, এতদিনে বোধ করি, বাঙ্গালা ভাষা নাটকের উপযোগী পরিচ্ছদ চিনিয়া লইয়াছে।"

আর ১২৮৮ সালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল—"আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে, কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।"—যিনি যৌবনে 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র ন্যায় কাব্য লিখিয়াছিলেন, তিনি এ কথা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

প্রসঙ্গতঃ এখানে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যদিও এই ছন্দ অনেক দিন হইতে 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে, আমরা কিন্তু উহার স্রষ্টা-হিসাবে গিরিশচন্দ্রের নাম কখনও করি নাই, এবং অভিনয়-ক্ষেত্রে তিনিই যে উহা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলি না। উহার প্রকৃত স্রষ্টা—কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় উহার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ১২৭৯ সালে—অর্থাৎ, যে বৎসরে ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অভ্যুদয় হয়, সেই বৎসরে ব্রজমোহন রায় পাঁচালী ছাড়িয়া যে যাত্রার দলের সৃষ্টি করেন, সেই যাত্রায় অভিনীত তাঁহারই রচিত

'দানব-বিজয়' গ্রন্থে ঐ ছন্দ প্রথম প্রচলিত হয়। ইহার নমুনা-স্বরূপ উক্ত পালা-গ্রন্থ হইতে দানব শুম্ভের একটু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"যে জ্বালা দিয়াছে কালী এ কাল সমরে,
তার প্রতিফলে, রীতিমত
প্রতিফল প্রদানিব আজ।
প্রদানিব শিক্ষা শিবানীরে!
মহাপ্রভু মহাগুরু মহারুদ্র তুমি,
দেহ রুদ্র-তেজ মোরে,—
যে তেজে খর্ব্বিতে পারি
গর্ব্ব পার্ব্বতীর।"

তবে এই ছন্দকে যাত্রার আসর হইতে থিয়েটারের ষ্টেজে গিরিশচন্দ্রই যে সাহস-পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথম আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই হাতে পড়িয়া যে উহার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

শুধু ছন্দ নহে; অভিনয়-কলার সৌন্দর্য্য-বিধানের উদ্দেশ্যে যাত্রার আরও একটি সম্পদ্‌কে তিনি তাঁহার নাটকের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। যাত্রার যে "মধুর রসের সঙ্গীত-স্রোত লোপ পাইল" বলিয়া তাঁহার আক্ষেপোক্তি দেখা যায়, সেই স্রোতকে ফিরাইয়া তিনিই তাহা থিয়েটারে আনিয়াছিলেন। গানই যাত্রার প্রাণ। এই জন্য যাত্রার অপর একটি নাম—গীতাভিনয়। একটু লক্ষ্য করিলে, এ দেশের কীর্ত্তন, কথকতা ও পাঁচালীর মধ্যেও গীতাভিনয়ের রূপ কতকটা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার বড় বড় কীর্ত্তনীয়ারা কেবল গায়কই ছিলেন না,—পাকা অভিনেতাও ছিলেন। সে অভিনয় চোখ-মুখের ভাব-ভঙ্গিতে যেমন ফুটিত, গলার আওয়াজেও তেমনি সুস্পষ্ট হইত, সুরের লহরী-লীলায় তাহা যেন সজীব হইয়া উঠিত। কথকতাও কতকটা তাই ছিল। শ্রীধর কথকের জীবন-কথায় দেখিতে পাই—"কথকতা-শিক্ষার কালে তিনি কখন কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটি বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের তখনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন; আবার কখন-বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব-গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতি-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন। - - - - তাই তিনি আদর্শ কথক হইয়াছিলেন।"—সুতরাং বুঝিতে হইবে, আকারে ও প্রকারে পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রভেদ থাকিলেও বাঙ্গালার এই সব নিজস্ব সামগ্রীর প্রত্যেকটিই

স্বল্প-বিস্তর সঙ্গীতে ও অভিনয়ে সম্মিশ্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা বাঙ্গালার আব-হাওয়ারই গুণ। কথকতার জন্মদাতা গদাধর শিরোমণির* ন্যায় গিরিশচন্দ্রও কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া উহা বুঝিয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, তাঁহার নাটকগুলিতে তিনি এমন কৌশলের সহিত সঙ্গীত-সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে নাট্যরস বাধা না পাইয়া অধিকাংশ সময়ে স্ফূর্ত্তি-লাভেরই পথ পাইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটকে গান যে এক-আধটু থাকিত না, এমন নহে। তবে সে সব গান দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন গায়ের জোরেই গানের নাম লইয়া নাট্য-গ্রন্থের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অঙ্গ হইতে যদি আমরা পাগলিনীর গান, বা রাখাল-বালকের গান, কিংবা ভিক্ষুকের গানকে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, নাটকখানি নির্জীব ও চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ইহাতে টহলদারদিগের যে গান আছে, তাহাও নিরর্থক বা অসাময়িক নহে। বিল্বমঙ্গলের চিত্ত-পরিচালনে সে গানের বিশেষরূপ সার্থকতা দেখা যায়। শুনিতে পাই, একদিন সন্ধ্যাকালে এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিয়াছিল,—"বাবা, বেলা যে গেল, বাস্‌নায় আগুন দাও"—সেই সময়ে এ কথা লালাবাবুর কাণে গিয়া তাঁহার মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলেন। এই নাটকেও দেখিতে পাই, বিল্বমঙ্গল যখন বার-বিলাসিনীর দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হইয়া তাহাকে দেওয়ালের দড়ি দেখাইতে যাইতেছেন, সেই সময়ে—

* "একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী-নিবাসী গদাধর শিরোমণি মহাশয় একস্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্যান্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে, সেইখানে সকল লোকে যাইতেছে। শিরোমণি বলিলেন, 'আচ্ছা, সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত-গান শুনিতে পাইবে।' পরদিন বৈকালে তিনি নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন। চারিদিক্ হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত-পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। ------ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি।"

—ভোলানাথ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "সেই একদিন আর এই একদিন" গ্রন্থ।

কালের সেই সন্ধিক্ষণ অতি প্রত্যূষে, টহলদারেরা পথে গান করিয়া চলিয়াছে :

"কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত, কি হবে তোর তবে ?
আজ পোহালে, কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে ?
সাধ কখনো মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কাজ,
কেউ কারো নয়, দেখ্‌ না চেয়ে,—কবে ফুটবে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল্‌, হরি ব'লে ডাকি।"

এই গান শুনিয়া বিল্বমঙ্গল বিচলিত হইলেন। তাঁহার আঘাত-প্রাপ্ত হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। তিনি বলিলেন,—"সত্য, সকলই মায়া! কই, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি ;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সে ত আমার নয়! আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়।"

তাঁহার গানের গুণ-সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। তিনি গান জিনিষটাকে যে শুধু নাটকের সঙ্গে প্রাণ-গত বন্ধনে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহার এই সব সঙ্গীতের মধ্যে এমন প্রাণ-গলানো খাঁটি দেশী সুরের গান অনেক আছে, যাহার তুলনা খুঁজিতে গেলে, মনে হয়, একমাত্র বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদের সঙ্গীত-ভাণ্ডার ছাড়া আর কোথাও তাহা পাওয়া যাইবে না। তাঁহার 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গান শুনিবার সময়ে রাম বসুর 'আগমনী' ও সাধক কমলাকান্তের বিজয়া-সঙ্গীত আমাদের মনে পড়ে। তাঁহার শ্যাম- ও শ্যামা-বিষয়ক গীতাবলি শ্রীধর কথক, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, রসিক রায় প্রভৃতি ভক্ত ভাবুকগণের প্রগাঢ়-ভক্তি-ভাবপূর্ণ সঙ্গীত-সমূহেরই স্মৃতি প্রাণে জাগাইয়া দেয়। তাঁহার প্রেম-সঙ্গীতগুলিরও গঠন-গৌরব ও ভাব-সৌরভ একালের প্রেম-সঙ্গীতে সুদুর্লভ।—তাহার সাদৃশ্য দেখিতে হইলে, সে-কালের নিধুবাবুর গানেরই শরণ লইতে হইবে। ইহা ছাড়া, নাটকের জন্য তাঁহাকে মাঝি, জেলে, সাপুড়িয়া, ব্যাধ, গুহক-চণ্ডাল প্রভৃতি কত রকম লোকের মুখে কত রকম-বেরকমের গান যে দিতে হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া বলা সুকঠিন। বঙ্গভাষায় ঠিক এ ধরণের গান গিরিশের পূর্ব্বে আর কেহ রচিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। গানগুলিতে তাঁহার অসামান্য নাট্য-নিপুণতার পরিচয় দেদীপ্যমান। ভাষার ভঙ্গীগত বৈষম্য-গুণে গানের ধর্‌তা শুনিলেই বুঝা যায়, কোন্‌ জাতীয় মানুষের মুখ দিয়া তাহা

বাহির হইতেছে। উদাহরণ ব্যতীত এ কথা যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদের জন্য গোটা দুই-তিন গানের গোড়াটুকু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সাপুড়িয়ার মুখে তিনি গান দিয়াছেন :—

"কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর।
কালনাগিনী কেটে গেল সোনার লকিন্দর রে,
সোনার লকিন্দর।"

তাঁহার 'কমলে কামিনী'তে মাঝি-মাল্লারা গান করিতেছে :—

"ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে, কত্তিছে গোঁ গোঁ—
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।"

তাঁহার 'বাসর' গীতি-নাট্যে হিজড়াদের গানে আছে :—

"পাঁচ পোয়াতির আশিস্ নিয়ে খকা আছে ভালো।
খকা কোল করেছে আলো, মায়ের কোল করেছে আলো।"

এই সকল গানের ভাষা ছাড়িলে, মাঝি-মাল্লার গান আর ঠিক মাঝি-মাল্লার গান থাকিবে না, সাপুড়িয়ার গান আর সাপুড়িয়ার গানের মতন মনে হইবে না। তাঁহার গানের ভাষা শুধু যে যাহার মুখের গান তাহারই মুখ চাহিয়া চলে, তাহা নহে ;—সেই সঙ্গে গানের যাহা বিষয়-বস্তু, তাহারও অনুগত হইয়া গানের প্রকাশ-ভঙ্গীতে একটা অপূর্ব্ব রূপ ফুটাইয়া তুলে। কথাটাকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহার 'জনা' নাটকের যে দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সেই দৃশ্যের একটি আট ছত্রের গানের রূপ এখানে দেখাইতেছি। গানের একটি করিয়া ছত্র শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যোগিনীরা গাহিয়াছেন। তারপর প্রমথগণ মহাদেবের উদ্দেশে পরবর্ত্তী ছত্র গান করিয়াছেন। গানটি এই :—

"যোগিনীগণ। বনফুলভূষণ শ্যাম মুরলীধর, গোপিনীরঞ্জন বিপিনবিহারী।
প্রমথগণ। বিভূতি-ছাদন বিষাণবাদন, ঈশানভীষণ শ্মশানচারী॥
যোগিনীগণ। দুকূল-চোরা রাস-রসিকবর,
প্রমথগণ। উলঙ্গ ভৈরব ধূর্জটি স্মরহর ;
যোগিনীগণ। রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু মঞ্জীর-গুঞ্জন,
প্রমথগণ। ডমরু ডিমি ডিমি তাণ্ডব-নর্ত্তন ;
যোগিনীগণ। মানোন্মাদিনী-রঙ্গিণী-গোপিনী-মোহন মান-ভিখারী।
প্রমথগণ। মূঢ় চন্দ্রচূড় হাড়-মাল-গল জটা-তরঙ্গিত-জাহ্নবী-বারি॥"

একটি গানের মধ্যে ভাব ও ভাষার এমন হরি-হর-সম্মিলন বঙ্গসাহিত্যের আর কাহারও গানে দেখি নাই। গিরিশচন্দ্র সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৭০টি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংখ্যা-হিসাবে হয়ত ইহার চেয়ে বেশী গান অপর কোন কবি লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়-অবলম্বনে এত বিচিত্র ভাবের গান এ দেশে আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। তিনি যদি ইংরাজি বা সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তাঁহার নাটক-রচনা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য আজ এই বিচিত্র ভাবের সঙ্গীত-সম্পদ্-রাশি হইতে নিশ্চিতই বঞ্চিত হইয়া থাকিত। গড্ডালিকা-বৃত্তির প্ররোচনায় যাঁহাদের সমালোচনা পরিচালিত হয়, তাঁহারা অবশ্য এই গানের জন্য গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রতি তেমন প্রসন্নভাব প্রকাশ করেন না। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাকে গান বর্জন করিয়া নাটক লিখিতে উপদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু তদুত্তরে তিনি তাঁহার 'পৌরাণিক নাটক'-নামক প্রবন্ধের একস্থানে বলেন,—"আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন; বোঝেন না—অপর ভাষায় গানের নাটক-উপযোগী হৃদয়-ভাব-ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-স্বর-রচয়িতার কতদূর হৃদয়হারী প্রভাব।---মূর্খের সঙ্গে বলি রাজা স্বর্গে যান নাই—মূর্খ সমালোচকের সহিত আমরা নরকে যাইব না।"

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের শুধু রূপ-গঠনের মূলে নয়,—তাঁহার চরিত্র-চিত্রণের মূলেও আমরা তাঁহার নট-সাধনার সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সেই কথাটা এইবার একটু ফুটাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

তাঁহার চরিত্র-স্মৃষ্টি-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন,—"অনুভূতির উপাদানে কল্পনা মিশাইয়া তিনি চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন।"—এ কথা কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাঁহার প্রগাঢ় অনুভূতি ও প্রবল কল্পনা-শক্তি-সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু এ দুই গুণের পশ্চাতে তাঁহার অপূর্ব্ব ঘটনা-বৈচিত্র্যময় জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতার যোগসূত্রটুকুকে না দেখিলে তাঁহার সৃষ্ট অনেক চরিত্রেরই অনেক রহস্য ঠিকমত বুঝা যাইবে না। তিনি নিজেই বলিতেন,—"জীবনে যে কখনও শোক-দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা,—বিশেষ নাটক-রচনা। নাট্যকারকে অনেক রকম অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে হয়। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য বেশ্যা- ও লম্পট-চরিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জগৎ-পূজ্য অবতার-চরিত্র পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ

করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।"—বাস্তবিক, এরূপ বহুবিধ মানব-চরিত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লাভ বড়-একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। এই অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের মূল ভিত্তি। তাঁহার থাকমণি চিন্তামণিকে যে বলিতেছে,—"বলি মাসি, তুমি দেখ্‌চি, বাছা ভালবাস। বল্‌বে, 'ভালবাসি ব'লে গাল দিচেচ,'—তা নয়।"—এ কথা যে গিরিশের মন-গড়া কথা নহে, তাহা তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। ভালবাসাটা বারাঙ্গনার পক্ষে যে গালাগালি, এ কথা গিরিশচন্দ্র তাহাদের নিকটই শুনিয়াছিলেন। তাঁহার 'জোবি' ও 'জগমণি' তাঁহারই চোখে দেখা তাঁহার পল্লীস্থ দুইটি স্ত্রীলোকের দুইটি নাম-সমেত চিত্র। তাঁহার 'পাগলিনী'ও শুধু অনুভূতি ও নিছক কল্পনার মিশ্রণে সৃষ্ট নহে। পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য যে এক পাগলী কাশীপুরের বাগানে যাইত, তাহারই চরিত্রের ছায়া-অবলম্বনে তিনি বিল্বমঙ্গল নাটকে 'পাগলিনী' আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার 'বিল্বমঙ্গলে'র এই উক্তি :

"ওই শঙ্খ-ঘণ্টা নাদে,
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন ;
দিন গেল—কই দেখা হ'ল ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময় !
প্রাণ করে আকুলি-ব্যাকুলি।"

ইহাও যে তাঁহার গুরুদেবের প্রথম যৌবনের সাধন-অবস্থার কথা, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত 'মদীয় আচার্যদেব'-নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি তিনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত। তিনি কাঁদিতেন ও বলিতেন,—'মা, আর এক দিন বৃথা চলিয়া গেল, এখনও তোমার দেখা পাইলাম না।' - - - অন্তঃকরণের প্রবল যন্ত্রণায় তিনি কখন কখন মাটিতে মুখ ঘষড়াইয়া কাঁদিতেন।"—এমন কি, তাঁহার অঙ্কিত শঙ্করাচার্য্য-চরিত্রকেও তাঁহার অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি বলিলে তেমন অন্যায় বা অসঙ্গত হয় না। এই নাটকের উৎসর্গ-পত্রে সে কথার সুস্পষ্ট আভাসও দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পরলোকগত-বন্ধুর উদ্দেশে উহাতে লিখিয়াছেন,—"আমরা

উভয়ে একত্র বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত দর্শন করেছি।"—সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ বা চরিত্র-সৃজনের স্বরূপ-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা যদি বাদ দিই, তাহা হইলে আমরা মূলে ভুল করিব।

তবে শুধু মানব-চরিত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিলেই যে চরিত্র-অঙ্কন-কার্য্যে নৈপুণ্য জন্মে, এমন কথা বলিতেছি, কেহ মনে করিবেন না। আমার মনে হয়, অভিজ্ঞতার উপাদানে যিনি যত বেশী আপনার অনুভূত ভাব ঢালিয়া দিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সেই অনুপাতে তত জীবন্ত আকারে দেখা দিয়া থাকে। অনুভূতি ও কল্পনা—এই দুই শক্তিরও গিরিশচন্দ্র অসামান্য অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম; এইবার তাঁহার অনুভূতি-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তাহা জানিলে, তাঁহার নাট্য-চরিত্র-সমূহের সজীবতা ও সুসম্পূর্ণতার কারণটুকু সহজেই সকলের উপলব্ধি হইবে বলিয়া আশা করি।

গিরিশচন্দ্রের মুখেও শুনিয়াছি, এবং তাঁহার জীবনী-গ্রন্থেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে যে, প্রত্যহ দিনের বেলায় আহারের পর তিনি একটু নিদ্রা- বা বিশ্রাম-লাভের জন্য তাঁহার শয়ন-ঘরে যাইতেন। একদিন শয়ন-গৃহে প্রবেশের অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ দেখা গেল যে, তিনি অতি ব্যস্তভাবে শয্যা-গৃহ হইতে বাহির হইয়া বেদনা-ক্লিষ্ট মুখে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। সহসা এরূপভাবে উঠিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"পাড়ার যে ছেলেটি সম্প্রতি জলে ডুবে মারা গিয়েছে, তার কথাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। জল-মগ্ন হবার সময়ে ছেলেটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কিরূপ ছট্‌ফট্ কোরেছিল, তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমারও শ্বাস রুদ্ধ হ'বার উপক্রম হ'লো। তাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার জন্যে বাইরে ছুটে এলাম।"—এই কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট যখন একবার বিবৃত করিয়াছিলাম, তখন তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন—"এমন ভাব-তন্ময়তার কথা আর কোনও কবি-জীবনে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।"—বাস্তবিক, গিরিশ-চন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে সৃষ্টি-শিল্পের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, কেবল মানব-প্রকৃতিতে তাঁহার গভীর জ্ঞানের কথা নয়,—সেই সঙ্গে তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব ভাব-তন্ময়তার কথাও মনে করিতে হইবে। আর কেমন করিয়া এই সুদুর্লভ শক্তির তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনের অনন্যসাধারণ ধ্যান-ধারণার কথাই আমাদিগকে জানিতে হইবে। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া

গিয়াছেন,—"স্বভাবের দান ছাড়া অভিনেতার শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। - - - কল্পিত চরিত্রের সহিত আপনাকে মিলাইয়া ধ্যান করা, চরিত্রের অনুরূপ কথা কওয়া, তাহার হাব-ভাব আনা—নটের অতি কঠোর-সাধনা।" —গিরিশচন্দ্রকেও এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল; এবং এই কঠোর সাধনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার অভিনয়-সময়ে দর্শকগণ অভিনীত চরিত্রকেই দেখিতেন,—অভিনয় কে করিতেছেন, তাহা সকলকে ভুলিয়া যাইতে হইত। যাঁহার অভিনয়-কৃতিত্বে অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া দর্শককে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে হয়, সেরূপ অভিনেতা জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জানি না; কিন্তু গিরিশচন্দ্র সত্যই সেইরূপ অভিনেতা ছিলেন। 'মিনার্ভা'য় ম্যাক্‌বেথ নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীতে—ম্যাক্‌বেথ-বেশী গিরিশ যখন ডন্‌ক্যান্‌কে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত হস্তে ভীষণ মূর্ত্তিতে ষ্টেজে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাস্তবিকই দুইজন বয়স্থ দর্শক ভয়ে বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অভিনেয় চরিত্রে নটের এইরূপ নিমগ্ন হওয়ার ভাবকেই নাট্যাচার্য্য ভরত ঋষি 'তন্ময়ত্ব' বলিয়াছেন। কিন্তু এই 'তন্ময়ত্ব' অর্থে নিজেকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়া নহে। যদি কেহ মনে করেন যে, অভিনয়-কালে নটের নিজত্ব-বোধের বিলয়-প্রাপ্তির নামই তন্ময়ত্ব, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। তন্ময়ত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া গিরিশচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—"মদ খাইয়া মাতাল মাতলামোতে তন্ময় হয়, কিন্তু সে মাতাল মাতালেরও অভিনয় করিতে পারে না। নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন;—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষি-স্বরূপ দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—নাটকের কথা ভুল হইতেছে কিনা? - - - এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যা-বলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে। মনের যে অংশে অভিনয় চলে, সে অংশের তন্ময়ত্ব প্রয়োজন, মনের যে অংশ সাক্ষি-স্বরূপ থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ, তন্ময় অংশই অধিক।"

এই তন্ময়ত্বই গিরিশচন্দ্র তাঁহার নট-জীবনের সাধন-ফলে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তিনি নাটক-রচনা-কার্য্যে যখন ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন উহা স্বভাবগত গুণের ন্যায় আপনা হইতেই তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিত। নাটক-রচনার সময়েও তিনি তাঁহার মনকে যেন দুই খণ্ড করিতেন,—এক খণ্ডে মন চরিত্র-অঙ্কনে তন্ময়, এবং মনের অন্য খণ্ড সাক্ষি-স্বরূপ দেখিত যে,

সে তন্ময়ত্ব স্থান, কাল ও চরিত্র-ভেদে সকল দিক্ বজায় রাখিয়া ঠিকভাবে চলিতেছে কিনা। উদাহরণ-দ্বারা কথাটাকে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য 'বিল্বমঙ্গল' নাটক হইতে একটি অতিক্ষুদ্র দৃশ্য এখানে তুলিয়া ধরিতেছি।

এই নাটকের যে স্থানে চিন্তামণির সন্দেহ দূর করিবার জন্য বিল্বমঙ্গল তাহাকে প্রাচীরের দড়ি দেখাইতে আসিয়া রজ্জুর পরিবর্তে কাল-সাপ দেখিতেছেন, সে-স্থানে আরও দুইজন লোককে আমরা উপস্থিত দেখিতে পাই। এক জন—থাকমণি, এবং অন্য জন—ভিক্ষুক। এই চারিজনের মধ্যে প্রত্যেকের উক্তির প্রতি সকলকে একটু লক্ষ্য করিতে বলি।—

"বিল্ব। এই দ্যাখ, দড়ি দ্যাখ।
চিন্তা। কৈ দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ও গো, মা গো! এ যে অজাগর গোখ্‌রো সাপ!
বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ।
ভিক্ষুক। ওগো ঠাকরুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দ্যায়, ল্যাজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েচে। (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হোত, সাতমহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আন্‌তে পার্‌ত!
থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ। নৈলে হৃদে পোড়ার মুখো?—খেংরা মারি, খেংরা মারি!"

কোন সাধারণ কবি হইলে, এ স্থলে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণিকে লইয়াই তিনি মাতামাতি আরম্ভ করিয়া দিতেন; ভিক্ষুক ও থাকমণির মনের কথা তাঁহার মনেই পড়িত না। তাহারা সাক্ষিগোপালের মতন হয় দাঁড়াইয়া থাকিত, নয়ত যাহা বলিত, তাহাদের মনটুকুকে কেহ দেখিতে পাইত না। কিন্তু এরূপ দোষ গিরিশচন্দ্রের প্রায় পনেরো আনা নাটকে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনের সাধন-লব্ধ তন্ময়ত্ব-গুণই যে ইহার প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মনের তন্ময়-অংশ ও সাক্ষী-অংশ পরস্পরে মিলিয়া ঠিকমত কাজ না করিলে পাকা লেখকের হাতে-আঁকা চরিত্রও যে কিরূপ বেতালা কথা বলে, তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বামী' নামে উপন্যাসের নায়িকা সৌদামিনী বলিতেছে,—"সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন, আমি জান্‌তুম না,

তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিক্‌টাকে আমি দু' হাতে ঠেলে রাখ্‌তুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেল্‌চি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না।"—এই সৌদামিনীই আর এক স্থলে স্বীয় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া বলিয়াছে,—"তিনি বলতেন, 'মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যতই ভাল বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে—যে মদ খায় না'।" বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের আঠার-উনিশ বৎসর-বয়স্কা মেয়ের মুখে এমনতর মদ ও মাতালের উপমা কোনও অবস্থায় স্বাভাবিক ও সম্ভব নহে। গিরিশচন্দ্রের কোন সামাজিক নাটকের কোনও চরিত্র-মুখে এমন অস্বাভাবিক উক্তি কেহ শুনিতে পাইবেন না। তাঁহার সামাজিক নাটকে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় নব্বুইটি পুরুষ-চরিত্র ও পঞ্চাশটি স্ত্রী-চরিত্র আছে। কিন্তু ইহারা কেহই বাস্তব পরিচ্ছদে অসামাজিক চরিত্র নহে। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর সংসার খুঁজিয়া দেখিলে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিকেই সকলে দেখিতে পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বর্গগত সুহৃদ্‌ শ্রীশচন্দ্রকে একবার লিখিয়াছিলেন,—"এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময়ে বাংলা দেশই ছিল কিনা, ভবিষ্যতে এ নিয়ে তর্ক উঠিতে পারে।" কিন্তু গিরিশ-সাহিত্য এই উক্তির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। বঙ্গ-সমাজের ও বাঙ্গালী-প্রকৃতির পর্দ্দা ভেদ করিয়া দৃষ্টি চালাইতে তাঁহার ন্যায় আর কোনও লেখক এ পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে করি না।

———

তৃতীয় বক্তৃতা

গিরিশচন্দ্রের গান ও ছন্দ-সম্বন্ধে বিশেষ কথা যাহা বলিবার ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এইবার তাঁহার নাটকের ভাষা ও কবিত্ব-প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। কারণ, এই দুইটা বিষয়-সম্পর্কে যুক্তিহীন উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রায়ই কাণে আসিয়া পোঁছায়। এক দল লোকের মতে, "গিরিশের নাটকে ভাষার দৈন্য ও কবিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়।" আর এক দল এ কথা একেবারেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। ফল কথা, এই উভয় পক্ষেরই মন্তব্য-মধ্যে কেবল 'হাঁ' ও 'না' ছাড়া বিচার-বিশ্লেষণের তেমন কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

তবে গিরিশচন্দ্রের ভাষা-সম্পদ্-সম্বন্ধে তাঁহার রচিত নাটক-আশ্রয়ে না হউক,—তাঁহার অনূদিত 'ম্যাক্‌বেথ'-অবলম্বনে দুই-চারিটি যুক্তির কথা কাহাকেও যে বলিতে না শুনিয়াছি, এমন নহে। মনে পড়ে, একজন শিক্ষক মহাশয়ের লেখায় দেখিয়াছি, তিনি স্যর আশুতোষকে বলিয়াছিলেন,—"আমরা পার্সিভ্যালের ছাত্র। তাঁর কাছেই 'ম্যাক্‌বেথ' পড়া। পার্সিভ্যাল সাহেব আমাদের পড়িয়েছিলেন—

'A sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd and munch'd and munch'd :

Notice the M-sound in the second line, it being an echo to the sense (the sound of mastication.)'

—গিরিশ ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন :

'এলো চুলে মালার মেয়ে
ব'সে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম
চাকুম্ চাকুম্ খায়'

আশ্চর্য্য! মূলের সে M-sound অনুবাদে 'ম'-কারে অবিকল অনুকৃত হইয়াছে। এইরূপে ম্যাক্‌বেথ বইখানার অষ্ট-পৃষ্টে দেখি, গিরিশ-প্রতিভা

যেন ঝল্‌মল্ করিতেছে। আরম্ভেই ডাকিনীদের সেই 'বাগ্‌বৈখরী শব্দ-ঝরা'—

'যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর'

মেঘে এই 'আ'-কার যে কবি দিতে পারেন, তিনি সামান্য শাব্দিক নহেন।

'ডুবু ডুবু হ'বে চাকি,—লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী?'

গিরিশচন্দ্রের ডাকিনীরা সূর্য্যদেবকে 'চাকি' বলে; সেক্সপিয়রের ডাকিনীদের উপর চাপান দিয়াছে।—ইহা শুনিয়া গুণগ্রাহী আশুতোষ প্রশংসার উচ্চ হাসি হাসিলেন।"*

বলা বাহুল্য, আশুতোষ যাহা শুনিয়া প্রশংসার হাসি হাসিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আবার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া থাকেন, এমন লোকও আছেন; কারণ, পৃথিবীতে শুধু কবিত্ব দুর্লভ নহে,—আশুতোষে যে গুণগ্রাহিতা ও রসগ্রাহিতা ছিল, তাহাও সুদুর্লভ। যাহা হউক, গিরিশ-কৃত ম্যাক্‌বেথ-অনুবাদে ভাষা-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব পরিচয় থাকিলেও, মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার লিখিত নাট্যসাহিত্যের ভাষা-চাতুর্য্য-প্রদর্শন-হিসাবে উহার উল্লেখ নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুবাদ-কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের তিনি উত্তম অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহারই রচিত পুরুবিক্রম নাটকের সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন,—ইহাতে "সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি-নীতি বিলক্ষণ জানেন, তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস-প্রধান, এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য-বিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুজরত ও মারফত লেখা আছে বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে, আর আমরা পড়িলাম।" অতএব বুঝিতে হইবে, নাটকের অনুবাদ করা এক কথা এবং নাটক-রচনা করা অন্য কথা। ভাষার লীলা-চাতুর্য্য একটিতে কেহ দেখাইতে পারিলে অন্যটিতেও যে তিনি তাহা দেখাইতে পারিবেন, এমন মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

* শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত "প্রথম সম্ভাষণে"।

কিন্তু এ সব কথা মনে রাখা দূরে যাউক, নাটকের ভাষা ও কবিত্ব-সম্বন্ধে আমাদের দেশে সচরাচর যাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নাটক জিনিষটা যে দৃশ্যকাব্য, নাট্যকারকে যে আত্মগোপন করিতে হয়, এবং সেই জন্য নাটকের চলিবার পথ যে কাব্য ও উপন্যাস হইতে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র, —এ সব কথা বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ গিরিশ-সৃষ্ট সাহিত্যের ভাষার যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহাদের প্রতি ঐ উক্তি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

নাটকের ভাষা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে বিধি-নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে,—"নাট্যকার এরূপ কৌশল ও নিপুণতার সহিত নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা রচনা করিয়া দিবেন যে, তাহা যেন চরিত্রের প্রকৃতি-অনুযায়ী হয়। পাত্র-পাত্রীদিগের নাম মনে রহিয়াছে, অথচ ব্যক্তি লক্ষ্য নাই, এরূপ স্থলে তাহাদের অবস্থাগত কথোপকথন শুনিয়া যদি ব্যক্তিগ্রহ না হয়, তবে সেটাকে ভাষার দোষ বা দৈন্য মনে করিতে হইবে। পাত্র-পাত্রীর কথা শুনিয়া ব্যক্তিগ্রহ—নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ।"—গিরিশ-চন্দ্রের নাটক অধ্যয়ন-কালে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ এই 'ব্যক্তিগ্রহ' কথাটার তাৎপর্য্যটুকু মনে রাখিয়া, যিনি তাঁহার নাটকের ভাষা-সৌন্দর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এ বিষয়ে অনেকে তাঁহার অনুকারী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন নাই। তাঁহার অঘোর, ভজহরি, সাধক, দুলালচাঁদ, কাঙ্গালীচরণ, জগন্নাথ, বিদূষক, গঙ্গা-রক্ষক, দানশা ফকীর, থাকমণি, চিন্তামণি, জোবী, হরমণি, সরস্বতী, বরুণচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া, লেটো, রঙ্গলাল, ভীম, অর্জুন প্রভৃতির প্রত্যেকের বাক্যেই যেন তাহাদের নিজ নিজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। বিরাট-রাজার রাজ-সভায় কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিয়াছে, এ জন্য ভীম ও অর্জুন উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। উভয়েরই ক্রোধের ভাষা আগ্নেয় গিরির নিঃস্রবের ন্যায়। কিন্তু উভয়ের উক্তির পূর্ব্বে কাহারও নাম যদি না থাকে, তথাপি তাহা শুনিয়া সকলে অনায়াসে বলিতে পারিবেন, কোন্‌টি কাহার উক্তি। অর্জুন আপন মনে বলিতেছেন:

"বার বার দ্রৌপদীর অপমান—
সম্মুখে আমার।
বনবাস, পরবাস,
লুক্কায়িত ক্লীববেশে ;—

ভগবান্, কিম্বধিক আর ?
হৃদয়ে অনল যত,
শরানল—প্রজ্বলিত তত
করিব সমর-স্থলে,—
খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল !
দেখিব—দেখিব, অক্ষয় তূণীরদ্বয়
কত শর করিবে প্রসব
সব্যসাচী-করে মোর ;
বুঝিব—বুঝিব, গাণ্ডীবের কত বল !
ধৈর্য্য দেহ, শ্রীমধুসূদন,—
সখার মিনতি শুন, হে পাণ্ডব-সখা !
দীননাথ, কবে হবে দিন—
বীর-অভিমানী কর্ণে'রে সমরে পাব ?
ওহো ! ক্লীবত্ব আমার !
অরির শোণিতে, জ্বালা কি নিভিবে কভু ?
হে মাধব,—রাধিকা-বল্লভ,
দুর্লভ পদারবিন্দে রেখো এ অধীনে।"

ইহারই পরবর্তী দৃশ্যে ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার বাক্যে 'বীর-অভিমানী কর্ণে'র নাম-গন্ধ নাই, ভগবানের নিকট ধৈর্য্য-ভিক্ষা নাই।

—অর্জুনের জন্যই 'গীতা'র সৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণ যদি ভীমের সারথি হইতেন, তাহা হইলে 'গীতা' রচিত হইত না।

ভীম আপন মনে বলিতেছেন :—

"কোথা তৃপ্তি,—কীচকের একমাত্র প্রাণ !
ছার সূতের নন্দন,
পদাঘাতে—পদাঘাত কিবা হবে শোধ !
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে !
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন—
বিদারি, শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর।
দুর্য্যোধন, হুতাশন—হুতাশন জ্বলে !—

ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর,
পদাঘাতে—কিবা হবে প্রতিশোধ!
বধিব না,—বধিব না তারে ;
উরু-ভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
সভীত নয়ন,
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টে চাহিবে যখন,—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত!
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব।"

উপরি-উদ্ধৃত অর্জুনের উক্তি ও ভীমের উক্তি, উভয়ই রৌদ্ররসের অভিব্যক্তি, অথচ ভাষা-ভঙ্গীর গুণে উভয়ের বাক্যে উভয়ের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যের রূপ-টুকু সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এত সুস্পষ্ট যে, উহা ব্যাখ্যা করিতে, বোধ হয়, সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না।

নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র আলোচনা-কালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০ সাল) লিখিয়াছিলেন,—"যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। অনেক নাটক-কর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বর-বিশিষ্ট হইয়া উঠে।" কিন্তু এ কথা শুধু 'অনেক নাটক-কর্ত্তা' নহেন, অনেক সমালোচকও বুঝেন না। তাঁহারা অনেক সময়ে নায়ক-নায়িকার মুখের বাগাড়ম্বরকেই ভাষা-সম্পদের পরিচয় মনে করিয়া তাহার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সমালোচকই গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের ভাষার প্রতি অধিক অপ্রসন্ন।

এখানে আরও একটি কথা বলিবার আছে। কথাটা এই যে, হৃদয় যখন কোনও বিশেষ ভাবে সমাচ্ছন্ন হয়, তখন তাহার যে অংশ ব্যক্ত হয়, তাহা নাট্যকারের অবলম্বনীয় হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, স্বভাব ও সাহিত্য এক

জিনিষ নহে। স্বভাবের ছবি মনোমধ্যে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া সাহিত্যের কাজ বটে, কিন্তু উভয়ের প্রকাশ-ভঙ্গী স্বতন্ত্র। "রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দোষ, গুণ, মনোহর, ভয়ঙ্কর, কুৎসিত-কদর্য্য,—মহতের মহত্ত্ব, নীচের নীচত্ব, —সংসারে বা স্বভাবে সবই আছে। শিল্প বা সাহিত্য সেই 'সব' হইতে রকমারি বাছিয়া, ঘসিয়া-মাজিয়া, কাটিয়া-ছাঁটিয়া, চোস্ত-দোরস্ত করিয়া, যাহার পর যেটি বসিলে মানুষের চোখে মানায়, মনের মত হয় ও মনের পরিসর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অথচ স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বভাবের সামগ্রীগুলি নিজের বক্ষে ধারণ করে। সাহিত্যের কাট-ছাঁট এমনতর হওয়া চাই যে, এক দিকে তাহা মানুষের মনে মানাইবে, আর এক দিকে স্বভাবের সহিত খাপিবে। উভয়ের কোনটির ব্যতিক্রম হইলে চলিবে না।"* উদাহরণের দ্বারা কথাটাকে আরও সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয়ের 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' আছে, শৈব্যা মৃত পুত্রকে শ্মশানে আনিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন,—'কি শুনি! বাপ্ রে! কি শুনি! ও বাপ্! তোরে কি পোড়াতে এসেছি? বাপ্ রে আমার! সোণার চাঁদ আমার! তোর সোণার অঙ্গ কেমন ক'রে—হায়, একি কথা—হায়! তোর অভাগিনী মার কপালে কি শেষে এই ছিল রে বাপ।"— ইত্যাদি এইরূপ প্রায় এক পৃষ্ঠাব্যাপী রোদন আছে। এই রোদন সত্যই শ্মশানে বসিয়া যিনি শুনিবেন, তাঁহার পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইবে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা যে কোন্ রস উদ্দীপন করিতেছে, অথবা থিয়েটারে বসিয়া উহা শুনিলে দর্শকের মনে কি ভাবের যে উদয় হইবে, তাহা বোধ করি প্রকাশ করিয়া না বলিলেও চলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, নাটক জিনিষটা সংসারের অনুকরণ হইলেও সংসারের হাসি-কান্না, সংসারের ক্রোধ ও শোক যে ভাবে প্রকাশ পায়, নাটক যদি তাহার অবিকল অনুলিপি লইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাতে রস-সৃষ্টি সম্ভব হইবে না। সন্তানের জন্য নাটকের পিতা ও মাতা শোক করিতেছেন, সে শোক সংসারের শোক হইতে কাট্-ছাঁট ও ঘসা-মাজা হইয়া কেমন করুণ রসের মূর্ত্তি-রূপে দেখা দিয়াছে, তাহারই দুইটি দৃষ্টান্ত গিরিচন্দ্রের 'বলিদান' নাটক হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

করুণাময়ের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা হিরণ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ-দর্শনে মাতা বিলাপ করিতেছেন,—"হিরণ রে—মা আমার, ওমা, তিন দিন যে তুমি মুখে অন্ন দাও নি! ওমা, পাপ-অন্ন মুখে দেবে না

* ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি'—নবজীবন, ১২৯৪।

ব'লে তাই কি ছেড়ে গেলে! ওঠো মা, ওঠো; আর অভিমান ক'রো না মা! কা'র ওপর অভিমান ক'রেছ? আমি যে তোমার রাক্ষসী মা! দুটি অন্নের জন্যে জলে ঝাঁপ দেছ!" ইহার পরই পিতার বিলাপ আছে। পিতার কিন্তু শোক-প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বলিতেছেন,—"এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা,—মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ! আহা, জল খেয়ে কি শীতল হ'য়েছ? মা, বড় জ্বালা পেয়েছ—বড় জ্বালা পেয়েছ! এখন কি জুড়িয়েছ?"—উভয়েরই শোক অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ কে না বলিবে যে, দুই জনেরই শোক যেমন স্বাভাবিক, তেমনি মর্ম্মভেদী।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নাট্যকার'-নামক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"যথায় উৎকট সমস্যা-স্থল, তথায় নাটককারকে আবরণ খুলিয়া মনোভাব দেখাইতে হইবে। উপন্যাসের নায়িকার মত 'বিষ' পান করিলেই চলিবে না। 'হাম্‌লেট' আত্মহত্যা করিবে কি না, তাহা বিরলে বসিয়া ভাবিতেছে বলিলে চলিবে না, তাহার জড়িত মস্তিষ্কে কিরূপ জড়িত ভাব প্রসূত হইতেছে, তাহা দেখাইতে হইবে। 'দুঃখের সাগর-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ—take up arms against sea of troubles' রূপ জড়িত উপমা—সে অবস্থায় প্রসূত হইবে। এই উপমা অনেকেই সর্ব্বাঙ্গীণ নয় বলিয়া দোষ দেন, কিন্তু নাট্যকার এরূপ সমালোচনার ভয় করিয়া উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারিবেন না।"—এইরূপ সূক্ষ্ম গুণপনার পরিচয়ও বঙ্গভাষায় একমাত্র গিরিশের নাট্যসাহিত্যে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার 'দক্ষ-যজ্ঞ' নাটকে গৌরব-মদ-মত্ত দক্ষ যখন প্রজা-স্থাপন-রূপ দুরূহ সমস্যার মীমাংসা-চিন্তায় নিমগ্ন, তখন তাঁহার মুখ হইতে যে ভাষা নির্গত হইয়াছে, তাহা 'জড়িত মস্তিষ্কের জড়িত ভাবেরই' ভাষা। দক্ষ আপনার মনে বলিতেছেন:

"তর্ক অতি চমৎকার,
কিন্তু দোষ মূলে।
প্রয়োজন বিনা,
একতা-বন্ধনে কভু না মানব রবে।
কত দিনে উঠে কথা—মায়ার বন্ধন!
অনুমান, অনুমান—
যুক্তিমাত্র নাহি তাহে।

মায়া—মায়া !
কিবা মায়া, কহ, কে বা জানে ?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে,
এ সংসারে মায়া নয় কিবা ?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম তরুলতাগণে ।
তবে মায়ার বন্ধনে
কি হেতু না রহে নর ?"

এখানে দক্ষের ভাষা যদি শ্রোতার ও তাঁহার এই উভয়ের যোগে তৈয়ারী হইয়া উঠিত, তবে তাহা দক্ষের একলার চিন্তা-চিত্র হইত না। গীতি-কাব্যে ইহা দোষের কথা বটে, কিন্তু নাটকে ইহা গুণপনারই পরিচয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটক হইতে এ ধরণের আরও একটি উদাহরণ দিতেছি। তাঁহার 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে কামোন্মত্ত কীচক বিরলে বসিয়া যখন দ্রৌপদীর রূপ-চিন্তায় বিভোর, তখন সে যে ভাষায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে, সে ভাষা কীচককে যে শুধু চিনাইয়া দেয় তাহা নহে, সেই সঙ্গে কীচকের মতন মানুষের জড়িত মস্তিকে কিরূপ জড়িত ভাব ও উপমাদি প্রসূত হয়, তাহাও উহাতে আমরা দেখিতে পাই। কীচক বলিতেছে :

"আজি, সেই ভাব পুনঃ মম—
পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায় !
মদনের হুতাশন !
বিশল্যকরণী মিলিবে যামিনীযোগে।
না, না,—রূপ তার না ভাবিব,—
উন্মত্ত হইব !
রাঙা রাঙা চারিদিকে—
যেন রুধির উগারে !
এখনো না নিভে আলো,—
হনুমান্ যামিনী আমার—
সে বাঁচাবে শক্তিশেলে।
ছার বায়স ডাকিল শিরে—
আঁচড়িল ভাবের জানকী মম।

এক চক্ষু অন্ধ রাম-বাণে,
কীচক-রামের বাণে দু'নয়ন যাবে কালি।"

শৃঙ্গাররসের ইহা এক অভিনব অভিব্যক্তি। ইহার ভাষায় যে দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা আছে, তাহা বুঝাইয়া না দিলে যিনি ইহার মর্ম্ম ও রস উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তাঁহার নিকট ইহা অবশ্য ভাষা-দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক-রূপেই প্রতীয়মান হইবে।

নাটকের 'ঘাত-প্রতিঘাতের' কথা আমরা শিখিয়াছি—পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদিগের নিকট হইতে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এ বিষয়ে প্রস্ফুট ধারণা আমাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। তাই গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের ভাষা-বৈচিত্র্যে যে মুন্সিয়ানা আছে, তাহা অনেক সময়ে ধরিতে পারি না; এবং তাহাতে যে সব অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, তাহাও অনেকের চোখে পড়ে না। গিরিশচন্দ্রই লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঔপন্যাসিক বা কবি গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন, সমস্ত অবস্থাই তাঁহার আয়ত্তাধীন, কিন্তু নাটককারকে হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আমূল গল্প করিতে হইবে। -------- নাট্য-কবিরও পাখীর গান, ভ্রমর-গুঞ্জন দর্শককে শুনাইতে হইবে, বর্ণনায় নয়—ঘাত-প্রতিঘাতে। কেবল বর্ণিত হইলে নাট্যরস থাকিবে না। 'রোমিও জুলিয়েট'-এ চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তাহা বর্ণিত চন্দ্র নয়, হৃদয়-প্রতিঘাতী চন্দ্র। তপোবনে বারি-সেচন ভ্রমর-গুঞ্জন বর্ণিত নহে,—হৃদয়-প্রতিঘাতকারী।"—গিরিশচন্দ্রের কথাগুলি ঠিক বুঝিতে পারিলে, তাঁহার অনেক নাটকেও আমরা এইরূপ অনেক সৌন্দর্য্য-সুষমা বুঝিতে পারিব। 'অশোক' নাটকের প্রথমেই বৌদ্ধ ভিক্ষু যে 'প্রকৃতির ভাবান্তর' দেখিতেছেন, তাহা হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে আছে, রাত্রিকালে উর্ব্বশী প্রান্তরে দাঁড়াইয়া যে বলিতেছেন:

"নিশীথিনী ভয়ঙ্করী আজি তারকা-চন্দ্রমা-হীনা,
অদৃষ্টের প্রতিরূপ মম।
ভীষণ পবন-স্বন মিশিতেছে দীর্ঘশ্বাসে,
হাহাকার প্রতিধ্বনি জলদ-গর্জন,
ধারা বরিষণে ঘন-আবরণ
দূরে যাবে যামিনীর,
হাসিবে সীমন্তে চন্দ্র পরি।

কিন্তু অনিবার আঁখি-ধারা-বরিষণে
ঘোর দুখ-তম নাহি যাবে দূরে,
সুখের চন্দ্রমা নাহি উদিবে ললাটে।"

এই বর্ণনা হৃদয়-প্রতিঘাতে প্রসূত হইয়াছে। আবার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে যে উষার উদয় দেখা যায়, তাহাও বর্ণিত উষা নহে—হৃদয়-প্রতিঘাতী উষা। বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন :

"ওই উষা—ও' ও ছায়া! মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা এ সকলি।"

নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' কাব্যের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেমন বলিতেছেন :

"লক্ষ্মী-পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে,
স্বষ্টির প্রথম অঙ্ক করি অভিনয়,
দেখ, পার্থ, সিন্ধু-গর্ভে উঠিছে কেমন!" ইত্যাদি।

এই ভাবে বিল্বমঙ্গলও যদি ঐ স্থানে উষাকালের একটি বর্ণনা আরম্ভ করিতেন, তাহা হইলে সে বর্ণনা কাব্যাংশে হয়ত উপাদেয় হইত, কিন্তু নাটকের পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠিত। বিল্বমঙ্গলের—"দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি" কথাটার গভীরতা একেবারে নষ্ট করিয়া দিত।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার 'ভবভূতি ও কালিদাস'-শীর্ষক প্রবন্ধের একাধিক স্থলে লিখিয়াছেন,—"নাটকে কবিত্ব থাকা চাই।" কিন্তু কবিত্বের লক্ষণ-সম্বন্ধে এত বেশী মত-ভেদ আছে যে, সে-সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একত্র করিলে তাহা একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করিতে পারে। অনেক সময়ে দেখিয়াছি, যে লেখা একজনের নিকট কবিত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই লেখায় অন্যজন কিছুমাত্র কবিত্ব নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবিত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের কোনও স্থানে কাহারও মুখ দিয়া জোর করিয়া কবিত্ব প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নাটকের যে-সব স্থানে কবিত্ব আছে, তাহা পড়িবার সময়ে কবিকে আমাদের মনে পড়ে না,—যে ঘটনা-প্রভাবে যাহার মুখ হইতে সে কবিত্ব বাহির হইয়াছে, তাহারই প্রকৃতিগত মনোভাবের চিত্র তখন শুধু দেখিতে পাই। ভীম-হস্তে কীচকের নিধন-মানসে দ্রৌপদী যখন তাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছেন, তখন কীচকের মনে কবিত্বরস উথলিয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছে,—

"নিশা-সরসে—কুসুম-কুলে
সুধীর নীহারে,
প্রণয়ীর প্রাণ বিকাশে আধার বরিষণে।"

কীচকের এই কবিত্বকে যদি কেহ গিরিশের কবিত্ব-বোধে ইহার বিচার করিতে বসেন, তাহা হইলে তাঁহার রস-বুদ্ধির কিছুতেই প্রশংসা করিতে পারিব না। "নাটকে কবিত্ব থাকা চাই"—এ কথা মনে করিয়া কবির কলম হইতে উহা বাহির হয় নাই।

'জনা' নাটকে আছে, পুত্রশোকাতুরা জনাকে যখন স্বাহা বলিতেছেন,—"মা কোথায় যাও,—কোথায় যাও! আমায় কি দোষে মাতৃহীনা কর।" —তখন জনা বলিয়াছেন,—

"কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।
দূরে—দূরে—
দিক্-অন্তে নিশার আলয় যথা,
যথা একাকার প্রলয় হুঙ্কার
উঠিতেছে রহি-রহি,
নাহি যথা সৃষ্টির অঙ্কুর,
দৃষ্টিহীন দিবাকর!
যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণমান—
যথা জড় জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত—
ঘোর ধূম-মাঝে,
চলে প্রলয়-জীমূতশ্রেণী,
বজ্র-অগ্নি-ধারা ঝরে।
যথা, ঘোর হাহাকার, পিনাক-টঙ্কার—
করি' স্থান পান শূল-করে মহারুদ্র ধায়,
যথা,
আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে—
প্রলয়-বিষাণ নাদে!
দূরে—দূরে—চল ত্বরা, পুত্র-শোকাতুরা।"

কবিত্বের লক্ষণ-সম্বন্ধে যতই মত-ভেদ থাকুক, জনার ঐ উক্তিতে কবিত্বের অভাব, এ কথা বোধ করি, অতি বড় অরসিক ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিবেন না।

এখানে পুত্রের মৃত্যু শোকের একমাত্র কারণ নহে,—অন্যায় সমরে পুত্র প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইল না, বীরাঙ্গনা জননীর পক্ষে সেও একটা বিষম শেল। সেই জন্য এই শোকোচ্ছ্বাস সাধারণ পুত্রহারা জননীর শোকোচ্ছ্বাসের মতন হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে, যে মাতা রণ-ক্ষেত্রে মৃত পুত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন :

"মমতা এস না বক্ষে মম!
জ্বল জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে!
পুত্রহন্তা জীবিত রয়েছে,
মমতার নহে ত সময়।
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে।
বীর-অবতার,
অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার—
নিত্য আসি মা ব'লে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা,—
'পুত্র-হন্তা অরি তোর জীবিত এখনো!'
শোণিতের সনে বহ গরল-প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাস-সনে,
পুত্র-হন্তা বৈরিরে নাশিতে।"

—পূর্ব্বোদ্ধৃত শোকোচ্ছ্বাস সেই মাতারই মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। শোকের ঐ কবিত্বময়ী ভাষার ভিতর দিয়া 'জনা'র মূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'আভাহীন বহ্নি জ্বলে ঈশানের ভালে'—ইহা যাহার হৃদয়ে শোক ও ক্রোধের বহ্নি জ্বলিতেছে, সে ছাড়া আর কে দেখিতে পায়?

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের এক স্থলে আছে, উত্তরা দ্রৌপদীকে বলিতেছে :

"বুঝিতে না পারি,
কেবা মায়াধারী তোমা দোঁহে!
শোক—নপুংসক বৃহন্নলা;

নহে কম গুণবতি,
যোগ্যা নারী তুমি তার।
সঙ্গীতের আছে কি আকার?
ভাবি বার বার, বৃহন্নলা গায় যবে,
উঠে যবে সে স্বর-লহরী,
হেরি যেন দেব-নারী উজ্জ্বল বিভায়
নৃত্য করে মধুরে মাতিয়া,—
পলে পলে বদন-মাধুরী
নব বিকসিত যেন।
দুলে দুলে মন্দাকিনী পূতবারি যথা,—
কভু চলে সে স্বর-প্রবাহ,
বিদ্যাধরী কেলি করে তায়;
কভু উচ্চ তান—ভানু দীপ্যমান—
কিরণ ঠিকরে কত!
হেরি শক্তিধর শিখী'পরে খেলে যেন!
কভু মেঘদলে সৌদামিনী খেলে,
বিষাদিনী এলায়িত বেণী, তোমা-সম
উন্মাদিনী, কাঁদে যেন শূন্যে বসি।"

এরূপ সরস কল্পনার সুন্দর কবিত্ব আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইহার আলম্বন ও বিভাবন অতি চমৎকার। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, গিরিশচন্দ্রের নাটকে কবিত্ব নাই বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ বা অভিযোগ করেন, তাঁহারা হয় তাঁহার নাটকাবলী ভাল করিয়া পড়েন নাই,—নয়ত, তাঁহারা কি বলিতেছেন, তাহা নিজেরাই ভাল করিয়া জানেন না। তাঁহার নাটক হইতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের আরও বহু উদাহরণ দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই আশা করি, আমার বক্তব্য বিশদ হইয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ-বর্ণনা-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি।

১২৮১ সালের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহার' কাব্যের সমালোচন-সময়ে বলেন,—"হেমবাবু কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষা কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধ-বর্ণনা একটি।"—এই বলিয়া তিনি জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার যুদ্ধ-বর্ণনাটুকু তাঁহার মাসিকপত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পর, ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ-বধ কাব্যের' সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়া তাহার সর্ব্বশেষে বলেন,—"হে বঙ্গ-মহাকবিগণ, লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।"

ইহার কিন্তু প্রায় চারি বৎসর পরে, গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ-বধ,' 'অভিমন্যু-বধ,' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি এমন কয়েকখানি নাটক রচিত হয়, যেগুলিতে কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শ নয়,—যুদ্ধেরও বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই; এবং তেমন জলন্ত বর্ণনা বঙ্গভাষায় তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোনও লেখক করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের সৈনিক-বর্ণিত যুদ্ধ-বারতার পাশে যদি 'অভিমন্যু-বধ' নাটকের রোহিণীর মুখ-নিঃসৃত যুদ্ধ-বর্ণনা ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথমটিই হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে। এই যুদ্ধ-বর্ণনার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:

"দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়
শিশু-বরাবরি রণে;
হুহুঙ্কারে পূরিল গগন,
দিগ্‌হস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে;
উথলিল সাগরের জল
বজ্রসম ধনুক-টঙ্কারে;
ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী
রথগ্রাম-সঞ্চালনে;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী,
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে
আঁধারিয়ে দশ-দিশি;
পিনাক-টঙ্কার-সম গর্জিল বিমানে
মহা অস্ত্র কোটি কোটি,—
চরাচর কাঁপিল তরাসে;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবি-করে
আচম্বিতে নিভিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল!

যথা, তুঙ্গ আগ্নেয় শিখর,
স্থির মহাবীর রণে,—
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারি ভিতে ;
যেন,
আঁধারে অন্তর-তাপে গর্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকার ছাড়িছে,
দ্রবময়ী ধাতু-প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজলিয়া দিশ-পাশ ;
যথা, পড়ে ধারা বিবিধ বরণ,
ভাসি' গ্রামপল্লী প্রান্তর-কানন,
অবিশ্রান্ত ঝরিছে চৌদিকে—
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী।" ইত্যাদি

আবার 'জনা' নাটকে প্রবীরের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও অতি মনোহর। দূরস্থিত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বৃষকেতু এই যুদ্ধ দেখিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :

"উত্তরে বিক্রম করে বৃকোদর-ঠাট,
সাত্যকি পশ্চিমভাগে চালিছে বাহিনী,
দৈত্য-সৈন্য ছোটে পূর্ব্বদ্বারে,
রাক্ষসীয় চমূ ধায় দক্ষিণ-দুয়ারে।
ধ্বজা হেরি জ্ঞান হয় মনে,
আক্রমিতে বৃকোদরে অগ্নি আগুয়ান।
ওই শুন অস্ত্র-ঠন্‌ঠনি,
বেধেছে সমর ঘোর।
তমাচ্ছন্ন হেরি অস্ত্র-জালে,
উল্কা-সম মহা-অস্ত্র চলে,
হানে কেবা কারে, নির্ণয় করিতে নারি।
হেরি একাকার, শুনি মাত্র অস্ত্রের ঝঙ্কার,
সৈন্যের হুঙ্কার ঘোর।

আশে পাশে পশ্চাতে সম্মুখে
মহাসৈন্য টলে,
যেন ঘোর রোলে সাগর-তরঙ্গ দোলে।
বাণ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে হরে অন্ধকার,
আঁধার বাড়ায় তায়।"

এই প্রকার শুধু যুদ্ধের চিত্র নহে,—যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার উদ্যোগ-চিত্রও যেরূপ কৌশলের সহিত সমুজ্জ্বল বর্ণে তাঁহার নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও বঙ্গসাহিত্যে তুলনা-রহিত মনে হয়। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটক যাঁহারা একটু ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বাক্য সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে করি। বৃহন্নলা যখন উত্তরকে সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, তখন দূর হইতে তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া কৌরব-পক্ষ যাহা বলিতেছেন, এবং অন্য দিকে বৃহন্নলা ভয়-বিমূঢ় উত্তরকে কুরু-সৈন্যের পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, এই উভয় পক্ষীয় উক্তিই সংক্ষিপ্ত হইলেও যেমন নাটকীয় কৌশলময়, তেমনি কবিত্বপূর্ণ। প্রথমে কৌরব-পক্ষের কথা শুনাইতেছি :

দুর্য্যোধন।— একি! নারীপ্রায়
পাছে ধায়,—দীর্ঘ বেণী নড়ে!
কৃপ।— পীন বাহু আজানুলম্বিত,
যেন ভুজঙ্গ ধাইছে
বাসুকি-দর্শন-হেতু!
দীর্ঘকায়, রমণী না হয় জ্ঞান,
হেরি মাত্র নারীর বসন—
যেন ভস্ম-আচ্ছাদনে ত্রিপুরারি!
দ্রোণ।— কহ, কিছু করিলে নির্ণয়?
জ্বলন্ত পাবক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে কেহ।
কর্ণ।— হাঃ হাঃ! হে আচার্য্য,
কত দিন নারী-বিদ্যা দিয়েছ অর্জ্জুনে?
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিত্রাণ!
দ্রোণ।— মুরহর চক্রধর-সম
ধায়, সিংহ যেন যায়,
ভীমকায় বিপক্ষ-তপন।

কৌরব-সম্মুখে আনি রথ রাখে—
হেন প্রাণ ধরে কেবা ?
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্ত্যে চক্রপাণি,
পাণ্ডব ফাল্গুনী বিনা ?
কর কি নির্ণয়
নারী-করে চলে হেন হয় ?—
উল্কা ছোটে মেদিনী মর্দ্দিয়ে।

এইবার যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে অপর পক্ষ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে।

উত্তরকে রথে উঠিতে বলায় উত্তর যখন অর্জুনকে বলিল :

"হুঁ, চালাইবে সাগর-মাঝারে,
সমুদ্র নিশ্চয়,—
মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়—
স্বকর্ণে শুনেছি সিন্ধু-নাদ।"

তখন অর্জুন বলিলেন :

"মূর্চ্ছা যাও ঘন ঘন,
কোন কথা নাহি শুন কাণে ;
উপমায় সাগর-সমান,
নহে ইহা জলনিধি।
ধবল আকার—
দেখ, দেখ, গোধন তোমার,
পতাকায় সাগর-লহরী ;
পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল—
জলপোত-সম হের ;
গর্জে সৈন্য সমুদ্রের সম।"

এমন কবিত্ব-কৌশলময় চিত্র আর কাহারও নাটকে কেহ দেখিয়াছেন কি ? ঠিক এই চিত্রেরই অনুকরণ দুই-একজনের লেখায় দেখা যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে আসলে ও নকলে যে তফাৎ হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

"উল্কা ছোটে মেদিনী মদ্দিয়ে"—এমন কথা নকলে নাই। বিশেষতঃ অনুকরণ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা সে দৃশ্যকে নাটকের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ঘটনা-সংস্থানে নৈপুণ্য ব্যতীত নাটককার এ কার্য্যে কৃতকার্য্যও হইতে পারেন না। 'যে সকল অবস্থা-বিশেষে নায়ক-নায়িকাদিগকে উপস্থাপিত করিলে, চিত্র-বিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে "সংস্থান" বলে।'

এই গুণপনার পরিচয় গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে যত বেশী আছে, তেমনটি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। অন্য সব লেখকের অধিকাংশ নাটকেই হাস্যরসের যে সকল চিত্র আছে, সেগুলিকে দেখিলেই মনে হয়, তাহারা যেন দর্শককে একটু হাসাইবার বা দর্শকের মনে একটু relief দিবার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকীয় ঘটনা-স্রোতের সহিত তাহারা অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংযুক্ত নহে। কিন্তু গিরিশের নাটকে যে সব হাস্যরসের দৃশ্য আছে, তাহাদের অধিকাংশই নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্র-প্রভাবে সংঘটিত হইয়া নাটকের পরিণতির পথকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। 'প্রফুল্ল' নাটকে কাঙ্গালীচরণের গৃহে মদনদাদার বিবাহের যে কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখা যায়, সে দৃশ্য শুধু দর্শকের মনে যে ক্ষণিক আমোদ প্রদান করে, তাহা নহে, —রমেশের চক্রান্তে সুরেশ ঐ দৃশ্যেই মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে পুলিশ-কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবং পরে মদনদাদা যাদবকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া জগমণির হস্তে যে সমর্পণ করে, তাহারও বীজ উহাতে উপ্ত হইয়াছে। নিষ্ফল হাস্যরসের ছবি তাঁহার নাট্য-গ্রন্থে বাস্তবিকই অতি বিরল, অথচ হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথন এবং কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন গিরিশের নাটকের মধ্যে যত বেশী আছে, তত আর কোথাও কেহ দেখিতে পাইবেন না। ইহাও গিরিশচন্দ্রের এক অসামান্য কীর্ত্তি।

এই সব কীর্ত্তির অপেক্ষা তাঁহার একটি বড় কীর্ত্তির কথা এখনও বলা হয় নাই। এইবার সেই কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

উৎকৃষ্ট নীতি ও ধর্ম্ম মানুষকে যে শিক্ষা দেয়, উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকাদিও সেই শিক্ষা প্রদান করে, ইহাই ছিল গিরিশচন্দ্রের ধারণা। তিনি নিজেই তাঁহার 'রঙ্গালয়' নামক নিবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"হীন কল্পনা-প্রসূত বিয়োগান্ত নাটকে কতকগুলি অস্বাভাবিক পাপের ছবি প্রদর্শিত হয়, শেষে কতকগুলি খুনাখুনি—সেই নিমিত্তই তাহার বিয়োগান্ত নাম। হীন কল্পনা-প্রসূত মিলনান্ত তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হয়। পাপের প্রতি ঘৃণা না হইয়া

পাপ আরও আদরের হইয়া উঠে। হীন কল্পনা-প্রসূত Burlesque ও Farce ব্যক্তি-বিশেষের কুৎসামাত্র ও কুৎসিত প্রসঙ্গ, কুৎসিত কথা—রসিকতা নামে সাধারণকে উপহার দেওয়া হয়। উন্নত-রুচি রঙ্গালয়ে এ সকল নাটককারের স্থান নাই।" তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন, "কেবল আনন্দ-দানে কলাবিদ্যা-বিশারদের তৃপ্তি নহে। তাহার আজীবন উদ্যম, কিরূপে আনন্দ-স্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি-সাধন করিতে পারে।" গিরিশের এই উক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ তিনি স্বয়ং। পাপের ছবি তাঁহার নাট্য-গ্রন্থে অনেক আছে বটে, কিন্তু সে সব চিত্র দেখিয়া পাপের প্রতি মনে ঘৃণারই সঞ্চার হয়। পাপকে কখনও তিনি মনোহর-রূপে বা প্রলোভনের আকারে অঙ্কিত করেন নাই।

আবার মনুষ্যত্বের আদর্শের চিত্রও তিনি এত বেশী বিভিন্ন প্রকারের আঁকিয়া গিয়াছেন, যাহা দেখিলে এ বিষয়ে তাঁহাকে অপরাজেয় বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি ও হৃদয়ে শান্তি, ইহাই যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ হয়, তবে সে আদর্শের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার সৃষ্ট রঙ্গলাল, চিন্তামণি, লেটো, চরণদাস, ফকীররাম, নসীরাম প্রভৃতি বহু চরিত্রেরই উল্লেখ করিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ভক্তি, প্রীতি, শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তি অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে?" গিরিশচন্দ্র এই 'মোহিনী মূর্ত্তি'-অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; এবং এই জন্যই মনে হয়, তিনি যখন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট সন্ন্যাস চাহিয়াছিলেন, তখন পরমহংসদেব তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে রঙ্গালয়ের কার্য্য করিতে উৎসাহ দিয়া বলেন,—"তুমি যে কাজ করিতেছ, তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।"

তাঁহার সাহিত্যাদর্শের স্বরূপ বা মর্ম্ম বুঝাইতে গেলে তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটক-অবলম্বনেও কিছু বলা প্রয়োজন। মহাজনের বাক্যে আছে,—

"বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।"

অর্থাৎ, বেদ প্রভুর ন্যায়, পুরাণ মিত্রের ন্যায় এবং কাব্য প্রিয়তমার ন্যায় জীবকে উপদেশ দিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, পুরাণের ভাব ও আদর্শ বাঙ্গালীর অন্তঃপ্রকৃতি-গঠনে যতটা সহায়তা করিয়াছে, ততটা আর কিছুতে করে নাই। যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতির সাহায্যে বাঙ্গালী বহুকাল হইতেই পৌরাণিকী কথা হৃদয়স্থ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ব্রত-অনুষ্ঠানে—পূজা-পার্ব্বণে পুরাণের প্রভাবই বেশী লক্ষিত হয়। এমন কি, বঙ্গবালিকাদের 'ব্রতকথা'র

মধ্যেও আছে,—"সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব" ইত্যাদি। অন্য দিকে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, পুরাণ-প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের আদর্শকেই শিরোধার্য্য করিয়া তথায় স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে,—"চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রাপ্তিঃ কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদি।" কিন্তু কালের এমনি বিচিত্র গতি যে, এই বঙ্গদেশেই এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন বাঙ্গালার অনেক কৃতবিদ্য এই চরিত্রাদর্শকে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারি, সে সময়ে "কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কাল-স্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত।"*

অবশ্য এই ভাঙ্গনের সময়ে গড়নের কার্য্য যে কিছু হয় নাই, এমন কথা বলি না। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের যে অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা গর্ব্ব ও গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহাও এই সময়ে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তাহার এই গঠন-ক্রিয়ার মধ্যেই ভাঙ্গনের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন যে শুধু পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা নহে; সেই সঙ্গে দেশ-পূজ্য মনুষ্যত্বের আদর্শকেও ভাঙ্গিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' পড়িবার সময় রাবণের প্রতিই শ্রদ্ধা হয়, মেঘনাদকেই ভাল লাগে—রাম বা লক্ষ্মণের মত হইবার সাধ বা প্রবৃত্তি কাহারও মনে কখনও জাগে না। রামায়ণে যাঁহাকে 'নরচন্দ্রমা' বলা হইয়াছে, তাঁহাকে কেবল মধুসূদন নহেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমন সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"রামচন্দ্র অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন। . . . . তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে সীতা-বিসর্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই যুগেরই মানুষ হইয়া ঠিক ইহার বিপরীত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের রাম-চরিত্র ও মেঘনাদ-চরিত্রের যে অভিনয় করিয়া তিনি প্রথম যৌবনে 'বঙ্গের গ্যারিক' নামে পরিচিত হন, তাঁহার সেই অভিনয় মধুসূদনের অঙ্কিত ভীরু রামকে দর্শক দেখিতে পান নাই।

* 'কবি হেমচন্দ্র'—উপক্রমণিকা।

যখন নৃমুণ্ডমালিনী রামকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন রাম-রূপী গিরিশ দৃপ্তস্বরে বলিতেন,—

> "জনম রামের রমা, রঘুরাজকুলে
> বীরেশ্বর "—ইত্যাদি।

তারপর যখন বিভীষণ বলেন,—

> "দেখ
> প্রমীলার পরাক্রম, দেখ বাহিরিয়া,
> রঘুপতি, দেখ দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
> না জানি এ বামাদলে কে আঁটে সমরে
> ভীমরূপা, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
> রক্তবীজ কুল-অরি!"

তদুত্তরে রাম-বেশী গিরিশ উপেক্ষাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন,—

> "দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
> রক্ষোবর, যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি "—ইত্যাদি।

গিরিশবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ঈষৎ হাস্যে নট প্রকাশ করিতে চাহিতেন যে, রাবণের সহিত যুদ্ধার্থে অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক লঙ্কায় আসিয়াছি—রমণীর বীরত্ব আর কি দেখিব।"

শ্রীরামচন্দ্রের কোনও কর্ম্মকেই গিরিশচন্দ্র 'নিন্দনীয় কর্ম্ম' বলিয়া মনে করিতেন না। বঙ্কিমাদি মনীষিবগ রামচন্দ্রকে 'যে সকল অপরাধে অপরাধী' বোধ করিতেন, গিরিশচন্দ্রের নিকট সেই সকল অপরাধই ঐশ্বরিক গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের এক স্থানে আছে,—মনীষিশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার গিরিশচন্দ্রকে বলিতেছেন, —"রামকে অবতার কেমন ক'রে বলি? প্রথমে দেখ বালী-বধ—লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হ'লো। এতো মানুষের কাজ, ঈশ্বরের নয়।" গিরিশচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন,—"মহাশয়, এ কাজ ঈশ্বরই পারেন।" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পুনরায় বলেন,—"তারপর দেখ, সীতা-বর্জন।" ইহার উত্তরেও গিরিশ বলিলেন—"মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বরই পারেন, মানুষ পারে না।" এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে রামচন্দ্র-সম্বন্ধে গিরিশ-চন্দ্রের যাহা ধারণা, তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, এবং তিনি রাম-চরিত-অবলম্বনে যে কয়খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন, সে কয়খানিই যে নাট্যাংশে

উৎকৃষ্ট, অবশ্য এমন কথা বলি না, কিন্তু সেগুলিতে তাঁহার উক্ত ধারণারই পরিস্ফুট চিত্র আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার 'লক্ষ্মণ-বর্জনে' আছে, রামচন্দ্র বলিতেছেন :

"হে মানব,
হের মেদ-অস্থি-নিৰ্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ-সম,
মৰ্ম্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;—
তাপপূর্ণ দেহ সুখাগার প্রেমে।
*　　*　　*　　*
প্রেমে পিতৃসত্য-হেতু গমন গহনে,
হারাইনু জানকীরে,
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি ;
সয়েছ' কি কভু
রাজ্য ত্যজি সীতাহারা-শোক ?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে কপি-সেনা সাথী,
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে দশানন-জয়ী খ্যাতি,
প্রেমের শাসনে রাম-রাজ্য অযোধ্যায়।
প্রেম-হেতু সীতা ত্যজি,—
লজ্বি' অলজ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যার লাগি !
জানকী-বিরহ—
পাষাণ বিদরে তাপে,
আছি স্থির, প্রেমের আশ্রয়ে।
ভবার্ণবে প্রেম ভেলা,
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।
পুনঃ হের সত্যপূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ বর্জন যাচে—বিধিদাতা বিধি।"

ইহাই গিরিশচন্দ্রের রামচন্দ্র। তাঁহার 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'সীতা-হরণ,' 'অকাল বোধন', 'রাবণ-বধ', 'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ-বর্জন'—

এই সাতখানি নাট্য-গ্রন্থেই রামচন্দ্র প্রেমের অবতার-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। ‘রাবণ-বধ’ নাটকে রাম রাবণকে জয় করিয়াছেন দুই বার: এক বার বাণ মারিয়া এবং এক বার ক্ষমা করিয়া। ইহার মধ্যে শেষের জয়ই তাঁহার লোক-পূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে। সীতা-বিসর্জন-ব্যাপারকে যে হিসাবে রামের ‘সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ’ বলা হইয়া থাকে, সে হিসাবে বিচার করিলে ‘লক্ষ্মণ-বর্জন’ ব্যাপারটা তাঁহার অনুষ্ঠিত আরও গুরুতর অপরাধ-রূপে গণ্য হইবার কথা। কিন্তু রহস্য এই যে, যাঁহারা সীতার জন্য কাতর হইয়া রামচন্দ্রের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও লক্ষ্মণ-বর্জন স্মরণ করিয়া রাম-সম্বন্ধে কখনও কিছু বলিতে শুনি নাই। সীতাকে হারাইয়াও রাম জীবিত ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে বর্জন করিয়া তিনি আর বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাই গিরিশের রামকে লক্ষ্মণ-উদ্দেশে বলিতে শুনি—“সীতা-হারা রামের জীবন।” এই ‘সীতাহারা রামের জীবন’কেও রাম যে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কিসের জোরে? গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন —তাহা প্রেমের বলে। তাই তাঁহার অঙ্কিত রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র দেখিয়া তখনকার ‘ভারতী’ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন,—“রাম ও লক্ষ্মণ হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বীরত্ব।” আর সেই সময়কার স্পষ্টবাদী সাপ্তাহিক ‘সাধারণী’ বলিয়াছিলেন,—“এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের রঙ্গভূমি বঙ্গ-দেশে, এই ম্লেচ্ছ ভাবানুকরণকারী সমাজ-মধ্যে, ইংরেজি কাব্য-নাটকের ভাবে-রসে, বচনে-ভঙ্গীতে পরিপূর্ণ-মস্তিষ্ক গিরিশচন্দ্র যে প্রাচীন বাঙ্গালীর হিন্দু-য়ানিতে এক-প্রাণ হইয়া এই পৌরাণিক নাটকগুলির অবতারণা করিয়াছেন, ইহাকেই বলি ক্ষমতা, ইহারই আমরা প্রশংসা করি। . . . . সেই দয়া এবং সত্যনিষ্ঠার অবতার রামচন্দ্র, সেই দৃপ্তির উজ্জ্বল চিত্র লঙ্কেশ্বর রাবণ, সেই সৌভ্রাত্রের সংস্থান লক্ষ্মণ, সেই সেবকশ্রেষ্ঠ হনুমান্, সেই বনবাসিনী সীতার একমাত্র রক্ষক—লব-কুশের মন্ত্র-শিক্ষক, ভারতের মহর্ষি, জগতের কবি বাল্মীকি; সেই রাক্ষসে দেব—দেবে রাক্ষস বিভীষণ, সেই চির-দুঃখে স্থিরা, সতীর আদর্শ সীতা, সেই দৃপ্তি-সহচরী মন্দভাগিনী মন্দোদরী—সকলই যেন পুনর্জীবিত হইয়াছেন। . . . . বাস্তবিক, এত দিনে ন্যাশন্যাল-থিয়েটার-স্থাপনা সার্থক হইল। গিরিশচন্দ্র রাম-লক্ষ্মণের গৌরব-ক্ষয়প্রয়াসী মধুসূদনের কাব্য পুনর্জীবিত করিবার জন্য রঙ্গাঙ্গনে যত্ন করিয়া যে পাপসঞ্চয় করিতেছিলেন, এত দিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল।”

গিরিশচন্দ্রের চিত্রিত কেবল রাম-চিত্র নহে, তাঁহার অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রও অঙ্কন-গুণে বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয়াসনে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুর এই চিরারাধ্য দেবতার চরিত্র লইয়াও তখনকার কালে আলোচনা-গবেষণা অল্প হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একাই তাঁহার সম্বন্ধে দুই বার দুই প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮১ সালের) বলেন,—"মহাভারতীয় কৃষ্ণ-চরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতিবিশারদের লক্ষণসকল দেখা যাইবে।" পরে তাঁহার এই মতের পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন যে,—"বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকার যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ।"—বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, বঙ্কিমের এই 'কৃষ্ণচরিত্র' culture theory অর্থাৎ অনুশীলন-তত্ত্বেরই উজ্জ্বল উদাহরণ। ইহার পর কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামক কাব্যত্রয়ের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে আঁকিবার চেষ্টা করেন, তাহাও অভিনব বটে, কিন্তু সে অভিনবত্ব শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ্য-বিরোধেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই সময়েই গিরিশের নাট্যসাহিত্যে বাঙ্গালী তাহার মনের মতন চির-নূতন শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার 'দীননাথ' নামক প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ কে?—ইহার উত্তর ব্যাসদেব আঠার পর্ব্বে দিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম—কৃষ্ণ দীননাথ।" তাঁহার নাটকের শ্রীকৃষ্ণও এই ভাবেরই সাকার ও সজীব মূর্ত্তি। আঘাতের বেদনায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আমরা বলিতে শুনি—

"দীন আমি, দীনসহ সম ব্যথা মম,—
বদ্ধ কারাগারে
দীন পিতা, জননী আমার
বেদনা-ব্যথিতা,
তবু সন্তান-কামনা
নাহি করে অভাগিনী।
জাগিছে প্রহরী,
পুত্রে ধরি তখনি বধিবে,
যমদূত নৃশংস কংসের দাস—
আশাশূন্য কারাগার-দ্বারে।

কারাগারে জন্মস্থান মম ;
ঘোরতর বারি-বরিষণ,
অশনি-নিঃস্বন,
ঘোর বাত শন্‌শনি প্রলয় দুর্য্যোগ,
কংস-চর অসংশয়ে নিদ্রাগত যাহে।
দীনের নন্দন,
দীন ক্ষীণ কোলে আসিনু যমুনা-পার---
দীন বৃন্দাবনে ;
দেখিলাম দীন-হীনগণে,
দীন নন্দ, দীনা মা যশোদা,
দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপাল-বালক---
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা।''

অবতার-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলেও বুঝা যায় যে, দুঃখ ছাড়া অবতার হয় নাই---হইতেও পারে না। ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না, এ প্রশ্ন-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে যাহা বুঝাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,---''নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কি করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন, বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা অসম্ভব। ---যাঁহারা আপত্তি করেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই রাবণ-কুম্ভকর্ণ অথবা কংস-শিশুপাল বধ করিতে পারেন? তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই যে, ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অবতার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন, তবে তাহাতে মানুষের কোনো শিক্ষা হয় না---পরন্ত তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব, তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়।--- এক্ষণে, তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন এবং মানুষের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে তিনি কি আদর্শরূপী মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না---তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার

শক্তির সীমা ?—বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।"

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত আপত্তি রবীন্দ্রনাথের। যাহা হউক, এই আপত্তিরই উত্তর আমরা গিরিশচন্দ্রের লেখায় দেখিতে পাই। "মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই ঈশ্বরের অবতার হইবার উদ্দেশ্য," এমন কথা গিরিশচন্দ্র বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম, অসুর-দমনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে এরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেন? লীলা বলিয়া আমার মনে তৃপ্তি জন্মিত না। এ কথার উত্তরে এখন মনে করি যে, কল্পতরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরেরা দুর্দ্দম হইত, অপরিমেয় শক্তি পাইত। সে শক্তি যদি স্বার্থ-চালিত না হইয়া নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে সে অসুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিশাইয়া যাইত। কিন্তু অসুরেরা স্বার্থপর, ভগবান্ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের দুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ হন, এবং কেবল অনিবার্য্য দয়া-শক্তি-প্রভাবে বর-প্রদত্ত আসুরিক দুর্দ্দম শক্তি পরাভূত হইত। অবতারকে নিজ শক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।" *

বস্তুতঃ, কংস, শিশুপাল, রাবণ অথবা হিরণ্যকশিপু—ইঁহারা কেহই বাইবেলের শয়তান ছিলেন না। জন্মান্তরীণ তপস্যা- বা সুকৃতি-বলে ইঁহারা সকলেই ভগবানের নিকট বর-লাভ করিয়া অমিত পরাক্রমের অধিকারী হন। কিন্তু এই পরাক্রম যখনই দুর্দ্দমনীয় হইয়া ধরা-বক্ষে দারুণ দুঃখোৎপত্তির কারণ হইয়াছে, তখনই ভগবান্ জীবের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে সেই পরাক্রম বা শক্তিকে বিনাশ করিবার জন্য অবতার-রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র কেবল তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে নয়, অন্য যে সব নর-দেহ-ধারী চরিত্রকে তিনি অবতার-রূপে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দয়ার ও প্রেমের অবতার-স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছেন। বলা অনাবশ্যক যে, এই আদর্শ কেবল পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণস্থায়ী কাল-বিশেষের আদর্শ নহে। ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার ইহা চিরন্তন আদর্শ। ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর মিথ্যা তর্কের মেঘ-জাল ছড়াইয়া হয়ত ইহাকে আবৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রই চিরস্থায়ী, মেঘ চিরস্থায়ী নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রস-সাহিত্যে রচনার রূপটাই আসল জিনিষ, বিষয়-বস্তুটা বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু আমরা বলি, রূপেরও দুইটি ভাব আছে

* গিরিশচন্দ্র-লিখিত 'কর্ম্ম' প্রবন্ধ।

—একটি মধুর এবং অন্যটি মঙ্গল ; আর সে রূপের ভাবটুকু বিষয়-বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত কোন মতেই ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ভক্তি, প্রীতি, ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, আত্মত্যাগ প্রভৃতিতে রূপ নাই, এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? গিরিশচন্দ্র মধুর ও মঙ্গলের রূপকেই তাঁহার স্থষ্ট অপরূপ নাট্য-রচনার ভিতর দিয়া নানাভাবে বিকসিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ এই যে, তাঁহার এই সাহিত্যাদর্শ এ দেশের সাহিত্যিকেরা এখনও ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই বোধ হয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একদিন বলিয়াছিলেন, —"গিরিশবাবুকে বাঙ্গালী চিনে নাই, এখনো চিনিবার বিলম্ব আছে। মৃত্যুর একশত বৎসর পরে ইংলণ্ডে যেমন সেক্স্পীয়রের আদর হইয়াছিল—তেমনি একদিন আসিবে,—যে দিন এ দেশ গিরিশচন্দ্রকে চিনিবে, তাঁহাকে আদর করিবে, তাঁহার গুণ-কীর্ত্তনে গর্ব্ব অনুভব করিয়া ধন্য হইবে। তাঁহার গান, তাঁহার নাটক যাচাই করিবার জন্য সাগরে পাড়ি দিতে হইবে না ; পশ্চিম হইতে বিদেশীয় শিক্ষার্থী আসিয়া নতজানু হইয়া শিখিয়া যাইবে—গিরিশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, গিরিশ-সাহিত্যের রসমাধুর্য্য।"

পরিশিষ্ট (ক)

গিরিশ-চিত্রিত চরিত্রাবলীর নাম-তালিকা

(অ-কারাদিক্রমে)

পুরুষ-চরিত্র

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
অ	
অগ্নি	জনা, নল-দময়ন্তী, রাবণ-বধ, তপোবল
অঘোর	হারানিধি
অঙ্গদ	সীতাহরণ, রাবণ-বধ
অচ্যুতানন্দ	মুকুল-মুঞ্জরা
অদ্বৈত	চৈতন্য-লীলা
অধীর	স্বপ্নের ফুল
অধ্যাপক	বাসর
অনাথনাথ	নসীরাম
অনিরুদ্ধ	পাণ্ডব-গৌরব
অনুশাল্ব	জনা
অভিনব গুপ্ত	শঙ্করাচার্য্য
অভিমন্যু	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
অমার্ক	প্রহ্লাদ-চরিত্র
অমূল্য	পাঁচকনে
অম্বরীষ	তপোবল, অভিশাপ
অরাতি	বুদ্ধদেব
অরুণ	হীরার ফুল
অর্জুন	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ, জনা
অলর্ক	বিষাদ
অশোক	অশোক
অশ্বত্থামা	অভিমন্যু-বধ

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
আ	
আওরঙ্গজেব	সৎনাম, ছত্রপতি
আকবর	আনন্দ রহো, রাণা প্রতাপসিংহ (অসমাপ্ত)
আকাল	অশোক
আগড় ব্যোম	অভিশাপ
আগমবাগীশ	করমেতি বাই
আত্মবোধ	বুদ্ধদেব-চরিত
আনন্দগিরি	শঙ্করাচার্য্য
আনন্দরাম	আয়না
আফ্‌জল খাঁ	ছত্রপতি
আবাজী	ঐ
আবুল ফতে খাঁ	ঐ
আবুহোসেন	আবুহোসেন
আমিয়ট (ইংরেজ কর্ম্মচারী)	মীরকাসিম
আমীরবেগ	সিরাজদ্দৌলা
আয়ান	নন্দদুলাল, প্রভাসযজ্ঞ
আরাব আলী (মীরকাসিমের সেনা-নায়ক)	মীরকাসিম
আলম্‌ খাঁ (মীরকাসিমের সেনা-নায়ক)	ঐ
আলাদিন	আলাদিন
আলী ইব্রাহিম (মীরকাসিমের বন্ধু)	মীরকাসিম
আলোক	করমেতি বাই
ই	
ইন্দ্র	অকাল বোধন, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, রাবণ-বধ, ধ্রুব-চরিত্র, হর-গৌরী, নল-দময়ন্তী, পাণ্ডব-গৌরব, তপোবল
ইন্দ্রজিৎ	সীতাহরণ
ইব্রাহিম (উপবন-রক্ষক)	পারস্যপ্রসূন
ইলিস্‌ (ইংরেজ কর্ম্মচারী)	মীরকাসিম
ঈ	
ঈশান	রূপ-সনাতন

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
উ	
উইলিয়ম বিলার্স	মীরকাসিম
উগ্রভৈরব	নসীরাম
,,	শঙ্করাচার্য্য
উজীর (সকতজঙ্গের)	সিরাজদ্দৌলা
উত্তমকুমার	ধ্রুব-চরিত্র
উত্তর	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
উত্তানপাদ	ধ্রুব-চরিত্র
উদয়নারায়ণ	ভ্রান্তি
উদয়ভানু	ছত্রপতি
উদ্ধব	প্রভাস-যজ্ঞ
উপগুপ্ত	অশোক
উপানন্দ	নন্দদুলাল
উপেন্দ্র	গৃহলক্ষ্মী
উমিচাঁদ (বণিক্)	সিরাজদ্দৌলা
উলুক	জনা
ঊ	
ঊষা	মণিহরণ
ঋ	
ঋতুপর্ণ	নল-দময়ন্তী
এ	
এল্ফদল (উজীর)	পারিসানা
এল্মোইন (ঐ)	ঐ
ও	
ওয়াট্স্ (কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ)	সিরাজদ্দৌলা
ওয়াট্সন্ (ইংরেজ সেনা-নায়ক)	ঐ
ওয়াল্স্ (ইংরেজ উকীল)	ঐ

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
ক	
কংস	নন্দদুলাল
কঞ্চুকী	পাণ্ডব-গৌরব
,,	রামের বনবাস
কণ্ঠীদাস	অভিশাপ
করিম	সৎনাম
করিম চাচা (কামিনীকান্ত)	সিরাজদ্দৌলা
করুণাময়	বলিদান
কর্ণ	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, বৃষকেতু
কলি	চৈতন্য-লীলা, নল-দময়ন্তী
কল্মাষপাদ	তপোবল
কহ্লাটক	অশোক
কাউলফ্	মনের মতন
কাঙ্গালীচরণ	প্রফুল্ল
কান্তিরাম	বেল্লিকবাজার
কাপালিক	নসীরাম
কাবজী	ছত্রপতি
কাম	চৈতন্য-লীলা, বুদ্ধদেব, জনা
কারগুরক খাঁ	সৎনাম
কার্তিক	হর-গৌরী, পাণ্ডব-গৌরব
কালনেমি	সীতার বিবাহ
কালপুরুষ	লক্ষ্মণ-বর্জন
কালাচাঁদ	পাঁচকনে
কালাপাহাড়	কালাপাহাড়
কালীকিঙ্কর	মায়াবসান
কালীঘটক	বলিদান
কিল্‌প্যাট্রীক্ (ইংরেজ সেনা-নায়ক)	সিরোজদ্দৌলা
কিশোর	বলিদান
কীচক	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
কুট (ইংরেজ সেনা-নায়ক)	সিরাজদ্দৌলা
কুঠিয়াল সাহেব	মীরকাসিম
কুণাল	অশোক
কুপার	মীরকাসিম
কুবের	হর-গৌরী

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
কুমার	মণিহরণ
কুমারিল ভট্ট	শঙ্করাচার্য্য
কুশ	সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
কুসংস্কার	বুদ্ধদেব-চরিত
কুহকী	আলাদিন
কৃতবর্ম্মা	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
কৃপাচার্য্য	ঐ
কৃষ্ণচন্দ্র	মীরকাসিম
কৃষ্ণধন	মায়াবসান
কৃষ্ণাজী পন্ত	ছত্রপতি
কেল্‌ড্‌	ঐ
কেশব ভারতী	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
কোণ্ডদেব	ছত্রপতি
ক্রকচ্‌	শঙ্করাচার্য্য
ক্রোধ	চৈতন্য-লীলা
ক্লাইব	সিরাজদ্দৌলা
ক্ষিতিধর	মুকুল-মুঞ্জরা

খ

খর	সীতাহরণ
খাণ্ডাধারী	চণ্ড
খুদিরাম	বেল্লিকবাজার
খোজা পিদ্রু	মীরকাসিম
খোবান খাঁ	ছত্রপতি

গ

গঙ্গাজী	ছত্রপতি
গঙ্গাদাস	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
গঙ্গাধর	বাসর
গঙ্গা-রক্ষক	জনা
গণক	অভিমন্যু-বধ
গণপতি	মায়াবসান
,,	শঙ্করাচার্য্য
গণেশ	হর-গৌরী

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
গবাক্ষ	সীতাহরণ
গয়	ঐ
গয়ারাম	ভ্রান্তি
গর্গমুনি	অভিমন্যু-বধ
গহন	দেলদার
গিরিরাজ	আগমনী
গুণনিধি	হারানিধি
গুরগিন খাঁ	মীরকাসিম
গুহক	রামের বনবাস
গোপীনাথ পন্ত	ছত্রপতি
গোবিন্দনাথ	শঙ্করাচার্য্য
গোবিন্দনাথ পন্ত	ছত্রপতি
গোরক্ষনাথ	পূর্ণচন্দ্র
গোলাম মহম্মদ	ভ্রান্তি
গৌরীশঙ্কর	আয়না

ঘ

ঘনশ্যাম	বলিদান
ঘেঁচি	শাস্তি কি শান্তি
ঘেসেড়া	পাণ্ডব-গৌরব

চ

চণ্ড	চণ্ড
চণ্ডগিরিক	অশোক
চন্দ্রধ্বজ	মুকুল-মুঞ্জরা
চরণদাস	সৎনাম
চিৎকুমার	ফণির মণি
চিৎসুখ	শঙ্করাচার্য্য
চিত্রভানু	মায়াতরু
চিনিবাস	আয়না
চিন্তামণি	কালাপাহাড়
চেম্বার্স	সিরাজদ্দৌলা

ছ

ছত্রপতি	ছত্রপতি
ছন্দক	বুদ্ধদেব-চরিত

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
জ	
জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ	মীরকাসিম, সিরাজদ্দৌলা
,, স্বরূপচাঁদ	মীরকাসিম
জগন্নাথ	বাসর
জগন্নাথ	শঙ্করাচার্য্য
জগন্নাথ মিশ্র	চৈতন্য-লীলা
জগাই	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
জটায়ু	সীতাহরণ
জন কার্ণাক	মীরকাসিম
জনক রাজা	সীতার বিবাহ
জমাদার	কালাপাহাড়
জম্বু	পূর্ণ চন্দ্র
জম্বুভয়	মোহিনী প্রতিমা
জয়দ্রথ	অভিমন্যু-বধ
জয়ধ্বজ (রাজা)	মুকুল মুঞ্জরা
জয়সিংহ	ছত্রপতি
জাফর খাঁ (সেনা-নায়ক)	মীরকাসিম
জাফর খাঁ (আওরঙ্গজেবের মন্ত্রী)	ছত্রপতি
জাম্বুবান	সীতাহরণ, মণিহরণ, লক্ষ্মণ-বর্জন
জিউ মহালা (সেনা-নায়ক)	ছত্রপতি
জিৎ সিং	বিষাদ
জীবন চক্রবর্ত্তী	রূপ-সনাতন
জেল-দারোগা	কালাপাহাড়
জোন্স্	মীরকাসিম
ট	
টাহার	মনের মতন
টুক্‌রো	করমেতি বাই
ড	
ডম্বরবাগীশ	অভিশাপ
ড্রেক	সিরাজদ্দৌলা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
ত	
তকী খাঁ (সেনা-নায়ক)	মীরকাসিম
তম্বুর	সীতার বনবাস
তানাজী	ছত্রপতি
তাল	রাবণ-বধ
তিলকদাস	অভিশাপ
তেজচন্দ্র বাহাদুর	হারানিধি
তোটকাচার্য্য	শঙ্করাচার্য্য
ত্রিশঙ্কু	তপোবল
দ	
দক্ষ	দক্ষযজ্ঞ
দধীচী	ঐ
দণ্ডী	পাণ্ডব-গৌরব
দমনক	মায়াতরু
দশরথ	সীতার বিবাহ
দাদোজী কোণ্ডদেব	ছত্রপতি
দানসা (ভণ্ড ফকীর)	সিরাজদ্দৌলা
দামোদর	পূর্ণচন্দ্র
দারুক	অভিশাপ
দিলির খাঁ	ছত্রপতি
দীননাথ	মায়াবসান
দুর্ব্বাসা	পাণ্ডব-গৌরব, মণিহরণ
দুর্য্যোধন	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
দুলাল	কালাপাহাড়
দুলালচাঁদ	বলিদান
দুঃশাসন	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
দূষণ	অভিমন্যু-বধ
দেলদার	দেলদার
দৈত্য	হীরার ফুল
দোকড়ি সেন	বেল্লিকবাজার
দোমা	করমেতি বাই
দ্বাপর	নল-দময়ন্তী
দ্রোণ	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
ধ	
ধনপতি	কমলে-কামিনী
ধনীরাম (দরওয়ান)	হারানিধি
ধনুন্তরি	সীতার বিবাহ
ধরণীবাবু (ডাক্তার)	হারানিধি
ধর্ম্মরাজ	তপোবল
ধীর	স্বপ্নের ফুল
ধৃষ্টদ্যুম্ন	অভিমন্যু-বধ
ধ্রুব	ধ্রুব-চরিত্র
ন	
নকুল	অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
নকুলানন্দ (অবধূত)	গৃহলক্ষ্মী
নন্দ	নন্দদুলাল, প্রভাসযজ্ঞ
নন্দকুমার	মীরকাসিম
নন্দী	আগমনী, দক্ষযজ্ঞ, সীতাহরণ, হর-গৌরী
নব	হারানিধি
নল	নল-দময়ন্তী
নল	সীতাহরণ
নসির খাঁ	রূপ-সনাতন
নসীরাম	নসীরাম
,,	বেল্লিকবাজার
,,	পাঁচকনে
নারদ	অকাল-বোধন, অভিশাপ, দক্ষযজ্ঞ, পাণ্ডব-গৌরব, প্রভাসযজ্ঞ, প্রহ্লাদ-চরিত্র
নারায়ণ	হর-গৌরী
নারায়ণ সিংহ	আনন্দ রহো
নালক	বুদ্ধদেব-চরিত
নিতাই	গৃহলক্ষ্মী
নিত্যানন্দ	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
নিধিরাম	পাঁচকনে
নিমাই	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
নিরঞ্জন	ভ্রান্তি
নীরদ	গৃহলক্ষ্মী

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
নীল	সীতাহরণ
নীলধ্বজ	জনা
নীলমাধব	হারানিধি
নীলোপন্ত	ছত্রপতি
নুরুদ্দিন	পারস্যপ্রসূন
নৃসিংহ	প্রহ্লাদ-চরিত্র
নেসা	দেলদার
নেহার	মনের মতন
ন্যগ্রোধ	অশোক

প

পবন	ধ্রুব-চরিত্র
পরশুরাম	সীতার বিবাহ
,,	করমেতি বাই
,,	সৎনাম
পরাশর	তপোবল
পর্ব্বত	অভিশাপ
পাগল	শাস্তি কি শান্তি
পাপ	চৈতন্য-লীলা
পীতাম্বর	প্রফুল্ল
পুঁটিরাম	বেল্লিকবাজার
পুরজন	ভ্রান্তি
পুরোহিত	বাসর
পুষ্কর	নল-দময়ন্তী
পূর্ণচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র
পূর্ণ রায়	চণ্ড
পোলাদ খাঁ	ছত্রপতি
প্রকাশ	শাস্তি কি শান্তি
প্রতাপ	আনন্দ রহো
প্রতাপ রুদ্র	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
প্রতিকামী	পাণ্ডব-গৌরব
প্রদ্যুম্ন	ঐ
প্রবীর	জনা
প্রবোধ	শাস্তি কি শান্তি
প্রভাকর	শঙ্করাচার্য্য

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
প্রসন্নকুমার	শান্তি কি শান্তি
প্রসেন	মণি-হরণ
প্রহ্লাদ	প্রহ্লাদ-চরিত্র
প্যালারাম	সপ্তমীতে বিসর্জন

ফ

ফক্‌রে	ফণির মণি
ফকীর	মনের মতন
ফকীর রাম	সৎনাম
ফুলারটন (ইংরেজ ডাক্তার)	মীরকাসিম
ফেরঙ্গজী (ফোকান্ দুর্গাধিপতি)	ছত্রপতি
ফেরেব খাঁ (জেল-দারোগার মোসাহেব)	কালাপাহাড়

ব

বক্রেশ্বর	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
বটকৃষ্ণ	শান্তি কি শান্তি
বণিক	বিল্বমঙ্গল
বরুণ	নল-দময়ন্তী
বরুণচাঁদ	মুকুল-মুঞ্জরা
বলরাম	প্রভাস-যজ্ঞ, পাণ্ডব-গৌরব, নন্দদুলাল
বল্লভ	রূপ-সনাতন
বশিষ্ঠ	তপোবল, রামের বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন, সীতার বিবাহ
বসুদাম	নন্দদুলাল
বাজী ফসলকর	ছত্রপতি
বাতুল	শ্রীবৎস-চিন্তা
বালী	সীতাহরণ
বাল্মীকি	সীতার বনবাস
বাসু (মিঃ)	শান্তি কি শান্তি
বাহার	ফণির মণি
বাহুরাজ	শ্রীবৎস-চিন্তা
বিকাশ	মলিনা-বিকাশ
বিক্রমাদিত্য	বাসর
বিদুর	পাণ্ডব-গৌরব
বিদূষক	জনা, নল-দময়ন্তী, ধ্রুব-চরিত্র, বুদ্ধদেব-চরিত

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
বিন্দুসার	অশোক
বিবেক	চৈতন্য-লীলা
বিভীষণ	সীতা-হরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
বিম্বিসার	বুদ্ধদেব-চরিত
বিরাগ	ফণির মণি
বিরাটরাজ	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
বিলাস	মলিনা-বিকাশ
বিল্বমঙ্গল	বিল্বমঙ্গল
বিশ্বকর্ম্মা	হর-গৌরী
বিশ্বামিত্র	তপোবল, সীতার বনবাস
বিশ্বেশ্বর	পাঁচকনে
বিষণ সিং	সৎনাম
বিষ্ণু	বৃষকেতু, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত, অভিশাপ, বুদ্ধদেব
বিষ্ণুপদ	বাসর
বীতশোক	অশোক
বীরসেন (রাজা)	মুকুল-মুঞ্জরা
বীরেশ্বর (অষ্টসিদ্ধ ব্রাহ্মণ)	কালাপাহাড়
বুদ্ধিমন্ত	রূপ-সনাতন
বৃষকেতু	জনা, বৃষকেতু
বেতাল	রাবণ-বধ, প্রভাস-যজ্ঞ
বেণীমাধব	শাস্তি কি শান্তি
বৈদ্যনাথ	গৃহলক্ষ্মী
বৈরাগ্য	চৈতন্য-লীলা
ব্রজেন্দ্র	হারানিধি
,,	আয়না
ব্রহ্মণ্যদেব	তপোবল
ব্যাট্‌সন্	মীরকাসিম

ভ

ভগদত্ত	অকাল-বোধন
ভজনরাম	মুকুল-মুঞ্জরা
ভজহরি	প্রফুল্ল
ভরত	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
ভামশা	আনন্দ রহো
ভিক্ষুক	বিল্বমঙ্গল
ভীম	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, অভিমন্যু-বধ
ভীমসেন	নল-দময়ন্তী
ভীষ্ম	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
ভৃঙ্গী	আগমনী, হর-গৌরী, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত্র
ভৈরব (মুন্সী)	হারানিধি
ভৈরবা (ভৃত্য)	গৃহলক্ষ্মী
ভ্যান্সিটার্ট (গভর্ণর)	মীরকাসিম

ম

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
মট্‌কো	আয়না
মদ	চৈতন্য-লীলা
মদন	জনা, হর-গৌরী, ধ্রুব-চরিত্র, হীরার ফুল
মদন ঘোষ	প্রফুল্ল
মণ্ডন মিশ্র	শঙ্করাচার্য্য
মন্ত্রী	নল-দময়ন্তী, দক্ষযজ্ঞ, জনা, অভিশাপ, তপোবল, ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, রাবণ-বধ, শ্রীবৎস-চিন্তা, নসীরাম, বিষাদ, বুদ্ধদেব, কালাপাহাড়, করমেতি বাই, বাসর, মুকুল-মুঞ্জরা, পারিসানা
মন্মথ	গৃহলক্ষ্মী
মন্সুরুদ্দীন (ওমরাহ)	কালাপাহাড়
মল্লিকজী (হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমান)	ছত্রপতি
মশুর	আবুহোসেন
মহম্মদ আমীন (মীরকাসিমের সেনানায়ক)	মীরকাসিম
,, ইসাখ (,, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী)	ঐ
মহাদেব	আগমনী, হর-গৌরী, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত্র, পাণ্ডব-গৌরব, প্রভাস-যজ্ঞ, জনা, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, রাবণ-বধ
মহান্ত (সৎনামী পণ্ডিত)	সৎনাম
মহীন্দ্র	মোহিনী প্রতিমা
মহেন্দ্র	অশোক
মাণিকচাঁদ	সিরাজদ্দৌলা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
মাৎসর্য্য	চৈতন্য-লীলা
মাধব	বিষাদ
মাধব	মায়াবসান
মাধাই	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
মানসিংহ	আনন্দ রহো, রাণা প্রতাপ (অসমাপ্ত নাটক)
মায়া	সপ্তমীতে বিসর্জন
মার	বুদ্ধদেব-চরিত, অশোক
মার্কণ্ড	মায়াতরু
মির্জান (বাদ্‌শা)	মনের মতন
মিরজাফর	সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
মীরকাসিম	ঐ ঐ
মীরণ	সিরাজদ্দৌলা
মীর দাউদ	ঐ
মীর মদন	ঐ
মীর সাহেব	সৎনাম
মুকুন্দদেব (উড়িষ্যার রাজা)	কালাপাহাড়
মুকুল	মুকুল-মুঞ্জরা
মুকুলজী	চণ্ড
মুক্তারাম	বেল্লিক বাজার
মুলানা আহম্মদ	ছত্রপতি
মুর্শিদকুলী	ভ্রান্তি
মুঁসালা	সিরাজদ্দৌলা
মেজর অ্যাডাম্‌স্ (ইংরেজ সেনাপতি)	মীরকাসিম
,, মনরো (,, ,,)	ঐ
মেরোপন্ত	ছত্রপতি
মোয়াজেম	ঐ
মোহ	চৈতন্য-লীলা
মোহনলাল	সিরাজদ্দৌলা
মোহিনীমোহন	হারানিধি

য

যম	নল-দময়ন্তী
যাদব	প্রফুল্ল
,,	মায়াবসান
যুধিষ্ঠির	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
যুসেন	মুকুল-মুঞ্জরা
যেদো	পাঁচকনে
যেসজী কঙ্ক (শিবাজীর বাল্য-সহচর)	ছত্রপতি
যোগেশ	প্রফুল্ল
যোগেশনাথ (গৌড়াধিপতি)	নসীরাম
যোধরাও	চণ্ড

র

রঘুদেবজী	চণ্ড
রঘুরাম	সৎনাম
রঙ্গলাল	ভ্রান্তি
রণমল্ল	চণ্ড
রণেন্দ্র	সৎনাম
রমেশ	প্রফুল্ল
রাগ	চৈতন্য-লীলা, বুদ্ধদেব-চরিত
রাজা	করমেতি বাই
,,	ফণির মণি
,,	মলিনমালা
রাজবল্লভ	সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
রাধাগুপ্ত	অশোক
রাবণ	সীতাহরণ, রাবণ-বধ
রামচন্দ্র	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
রামদাস	শঙ্করাচার্য্য
রামদাস স্বামী	ছত্রপতি
রামদীন	রূপ-সনাতন
রামনারায়ণ	মীরকাসিম
রামলাল	বলিদান
রামসহায়	আয়না
রামসিংহ (জয়সিংহের পুত্র)	ছত্রপতি
রায়দুর্লভ	সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
রায় রামানন্দ	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
রাসবিহারী	সিরাজদ্দৌলা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
রাহুল	বুদ্ধদেব-চরিত
রূপ	রূপ-সনাতন
রেমো মামা	বলিদান

ল

লব	সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
ললিত	পাঁচকনে
লহরকুমার	মলিনমালা
লক্ষ্মণ	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
লক্ষ্মীচরণ	বেল্লিক বাজার, পাঁচকনে
লাল সিং (মীরকাসিমের সেনানায়ক)	মীরকাসিম
লেটো (লাটু)	কালাপাহাড়
লোভ	চৈতন্য-লীলা

শ

শকুনি	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
শক্তি	তপোবল
শঙ্করাচার্য্য	শঙ্করাচার্য্য
শত্রুঘ্ন	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
শনি	শ্রীবৎস-চিন্তা
শম্ভাজী	ছত্রপতি
শম্ভাজী মোহিতে	ঐ
শরৎ	গৃহলক্ষ্মী
শান্তিরাম	শঙ্করাচার্য্য
,,	মায়াবসান
,,	পাঁচকনে
শালিগ্রাম	ভ্রান্তি
শালিবাহন	পূর্ণচন্দ্র
,,	কমলে-কামিনী
শিউলি	শঙ্করাচার্য্য
শিখণ্ডী	চণ্ড

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
শিবনাথ	প্রফুল্ল
শিবরাম	বিষাদ
শিবাজী	ছত্রপতি
শিবু (এটর্ণি)	গৃহলক্ষ্মী
শিবু চৌধুরী	বেল্লিক বাজার
শুক	রাবণ-বধ
শুদ্ধোধন	বুদ্ধদেব-চরিত
শুনঃশেফ	তপোবল
শুভঙ্কর	শাস্তি কি শান্তি
শূরধ্বজ	বাসর
শৈলেন্দ্র	গৃহলক্ষ্মী
শ্রীকান্ত	রূপ-সনাতন
শ্রীকাল দেবল	বুদ্ধদেব-চরিত
শ্রীকৃষ্ণ	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, পাণ্ডব-গৌরব, জনা, অভিমন্যু-বধ, প্রভাস-যজ্ঞ, নন্দদুলাল, দোল-লীলা, ব্রজ-বিহার, মণি-হরণ, ধ্রুব-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বিল্বমঙ্গল, নসীরাম, করমেতি বাই
শ্রীদাম	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
শ্রীবৎস	শ্রীবৎস-চিন্তা
শ্রীবাস	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
শ্রীমন্ত	কমলে-কামিনী
শ্যামা (ভৃত্য)	গৃহলক্ষ্মী
শ্যামাদাস	শাস্তি কি শান্তি

স

সকতজঙ্গ	সিরাজদ্দৌলা
সখারাম	শঙ্করাচার্য্য
সত্রাজিৎ	মণি-হরণ
সদানন্দ	তপোবল
সদাশিব	আয়না
সনন্দন	শঙ্করাচার্য্য
সনাতন	রূপ-সনাতন
সন্দেহ	বুদ্ধদেব-চরিত
সমরকন্ধাধিপতি	মনের মতন
সমরু (মীরকাসিমের সেনাপতি—ফরাসী)	মীরকাসিম

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
সরফরাজ	ভ্রান্তি
সরল	দেলদার
সর্ব্বেশ্বর	শাস্তি কি শান্তি
সলিমান (গৌড়ের নবাব)	কালাপাহাড়
,, (মীরকাসিমের ধন-রক্ষক)	মীরকাসিম
সহদেব	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু-বধ
সাগর	সীতাহরণ
সাতকড়ি	মায়াবসান
,,	সপ্তমীতে বিসর্জন
সাত্যকি	পাণ্ডব-গৌরব, অভিমন্যু-বধ
সাধক	বিল্বমঙ্গল
সামসের উদ্দিন (মীরজাফরের বন্ধু)	মীরকাসিম
সায়েদ খাঁ (ধনাঢ্য ব্যক্তি)	মনের মতন
সায়েস্তা খাঁ	ছত্রপতি
সারণ	রাবণ-বধ
সারথি	নল-দময়ন্তী
সার্ব্বভৌম	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
সাহ আলম (দিল্লীর সম্রাট্)	মীরকাসিম
সিদ্ধার্থ	বুদ্ধদেব-চরিত
সিদ্ধেশ্বর	মায়াবসান
,,	পাঁচকনে
সিন্‌ফ্রেঁ	সিরাজদ্দৌলা
সিরাজদ্দৌলা	ঐ
সুগ্রীব	সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
সুজাউদ্দৌলা	মীরকাসিম
সুপার্শ্ব	সীতাহরণ
সুবল	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
সুমন্ত্র	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস
সুরত	মায়াতরু
সুরেশ	প্রফুল্ল
সুরেরাও	ছত্রপতি
সুলতান মহম্মদ (নবাব)	পারিসানা
সুশর্ম্মা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ, অভিমন্যু-বধ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
সুষেণ (সৈন্যাধ্যক্ষ)	মুকুল-মুঞ্জরা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
সুসীম	অশোক
সূর্য্যদেব	শ্রীবৎস-চিন্তা, মণি-হরণ
সূর্য্যজী (শিবাজীর সেনানায়ক)	ছত্রপতি
স্থষ্টিধর	আয়না
সেন্‌জারা (নবাব-পারিষদ)	পারস্য-প্রসূন
সেবাদাস	পূর্ণ চন্দ্র
সেলিম	আনন্দ রহো, রাণা প্রতাপ (অসমাপ্ত;
সৈয়দবক্ত	ছত্রপতি
সোনাউল্লা (পাহারাওয়ালা)	হারানিধি
সোমগিরি	বিল্বমঙ্গল
সৌরভকুমার	ফণির মণি

হ

হনুমান	সীতাহরণ, অকাল-বোধন, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন
হরিদাস	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
হরিশ	হারানিধি
হলধর	মায়াবসান
হলওয়েল (কলিকাতার পুলিশ-অধ্যক্ষ)	সিরাজদ্দৌলা
”	মীরকাসিম
হস্তামলক	শঙ্করাচার্য্য
হামিদ খাঁ	সৎনাম
হায়বতুল্লা (মীরকাসিমের সেনানায়ক)	মীরকাসিম
হারীত	মায়াতরু
হারুণ-অল্‌-রসীদ	আবুহোসেন, পারস্য-প্রসূন
হিরণ্যকশিপু	প্রহ্লাদ-চরিত্র
হীরালাল	মোহিনী-প্রতিমা
হীরু ঘোষাল	গৃহলক্ষ্মী
হীরে	পাঁচকনে
হীরোজী	ছত্রপতি
হে	মীরকাসিম
হেবো	শাস্তি কি শাস্তি
হেমন্ত	মোহিনী-প্রতিমা
হেষ্টিংস	সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম
হোসেন সা'	রূপ-সনাতন

স্ত্রী-চরিত্র

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
অ	
অদৃশ্যন্তী	তপোবল
অন্নদা	ভ্রান্তি
অন্নপূর্ণা	প্রভাস-যজ্ঞ
,,	মায়ারসান
অম্বালিকা	শঙ্করাচার্য্য
অম্বিকা	করমেতি বাই
অরুন্ধতী	তপোবল
অলকা	রূপ-সনাতন
অহল্যা	সীতার বিবাহ
,,	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর
আ	
আবুর মা	আবুহোসেন
আমিনা বেগম (সিরাজের মা)	সিরাজদ্দৌলা
আরসা	পারিসানা
আলাদিনের মা	আলাদিন
আলিবর্দ্দী-মহিষী	সিরাজদ্দৌলা
ই	
ইচ্ছা	পূর্ণ চন্দ্র
ইমান (নবাব-কন্যা)	কালাপাহাড়
ইলিশ-পত্নী	মীরকাসিম
উ	
উগ্রচণ্ডা	সীতাহরণ
উজ্জলা	বিষাদ
উত্তরা	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিমন্যু-বধ
উদাসিনী	মায়াতরু

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
উভয়ভারতী	শঙ্করাচার্য্য
উমাসুন্দরী	প্রফুল্ল
উম্মৎ জহরা (সিরাজ-কন্যা)	সিরাজদ্দৌলা
উর্ব্বশী	পাণ্ডব-গৌরব, তপোবল

ঊ

ঊর্ম্মিলা	সীতার বনবাস

এ

এনসানি	পারিসানা

ক

কমলা (মোহিনীর স্ত্রী)	হারানিধি
কয়াধু	প্রহ্লাদ-চরিত্র
করমেতি	করমেতি বাই
করুণা	রূপ-সনাতন
কাঞ্চনমালা	অশোক
কাদম্বিনী (মোহিনীর রক্ষিতা)	হারানিধি
,,	পাঁচকনে
কামকলা	শঙ্করাচার্য্য
কালী	রাবণ-বধ
কালুন	আনন্দ রহো
কিরণ	বলিদান
কিশোরী	আয়না
কুটিলা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
কুন্তী	পাণ্ডব-গৌরব
কুমুদিনী (বারাঙ্গনা)	গৃহলক্ষ্মী
কুশলা	চণ্ড
কুসুম	মোহিনী-প্রতিমা
কৃত্তিকা	করমেতি বাই
কৈকেয়ী	রামের বনবাস
কৌশল্যা	রামের বনবাস, লক্ষ্মণ-বর্জন

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
খ	
খুল্লনা	কমলে-কামিনী
গ	
গঙ্গা	ভ্রান্তি
"	শঙ্করাচার্য্য
"	জনা
গরব	পাঁচকনে
গিন্নি	চণ্ড
গুঞ্জমালা	ঐ
গুলসানা	সৎনাম
গুহক-পত্নী	রামের বনবাস
গোপা	বুদ্ধদেব
গোলেন্দাম (বেগম)	মনের মতন
গৌরী	আগমনী, হর-গৌরী
গৌতমী	বুদ্ধদেব
ঘ	
ঘসেটি	সিরাজদ্দৌলা
ঘৃতাচী	তপোবল
চ	
চঞ্চলা	কালাপাহাড়
চন্দ্রকলা	অশোক
চামেলী	মুকুল-মুঞ্জরা
চিত্তহরা	অশোক
চিত্তেশ্বরী	শাস্তি কি শান্তি
চিন্তা	শ্রীবৎস-চিন্তা
চিন্তামণি (বারাঙ্গনা)	বিল্বমঙ্গল
চেদিরাজ-জননী	নল-দময়ন্তী
ছ	
ছুটাকী	ছুটাকী

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
জ	
জগমণি	প্রফুল্ল
জটিলা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
জনক-পত্নী	সীতার বিবাহ
জনা	জনা
জয়া	হর-গৌরী, পাণ্ডব-গৌরব
জহরা	সিরাজদ্দৌলা
জাম্বুবতী	মণি-হরণ
জিজাবাই	ছত্রপতি
জোবি	বলিদান
জ্যোতি	ঐ
ঝ	
ঝি	বলিদান
ত	
তন্দ্রা	নন্দদুলাল
তপস্বিনী	দক্ষ-যজ্ঞ
তমঃ	অভিশাপ
তরঙ্গিনী	গৃহলক্ষ্মী
তরলা	মলিনা-বিকাশ
তড়িৎসুন্দরী	আয়না
তারা	সীতাহরণ
,,	মুকুল-মুঞ্জরা
,,	মীরকাসিম
তৃষ্ণা	অশোক
ত্রিজটা	সীতাহরণ, রাবণ-বধ
থ	
থাকমণি	বিল্বমঙ্গল

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
দ	
দময়ন্তী	নল-দময়ন্তী
দয়া	বুদ্ধদেব
দাই	আবুহোসেন
দীর্ঘিকা	ধ্রুব-চরিত্র
দুর্গা	সীতাহরণ, রাবণ-বধ
দুর্ব্বলা	অভিশাপ
দুষ্টা সরস্বতী	ঐ
দেবকী	নন্দদুলাল
দেবী	অশোক
দেলেরা	মনের মতন
দোলেনা (নবাব-কন্যার সখী)	কালাপাহাড়
দ্রৌপদী	পাণ্ডব-গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
ধ	
ধারা	দেলদার
ন	
নায়িকা	জনা
নিকষা	রাবণ-বধ
নিদ্রা	নন্দদুলাল
নির্ম্মলা	শাস্তি কি শান্তি
নিস্তারিণী	মায়াবসান
”	পাঁচকনে
নীহার	মোহিনী-প্রতিমা
প	
পদ্মাবতী	বৃষকেতু
”	অশোক
পরিয়া (গোলেন্দামের সখী)	মনের মতন

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
পাগলিনী	বিল্বমঙ্গল
পান্না	মুকুল-মুঞ্জরা
পাপ	চৈতন্য-লীলা
পারিসানা	পারিসানা
পার্ব্বতী	শাস্তি কি শান্তি
পিয়াসা	দেলদার
পুতলা বাই	ছত্রপতি
পূর্ণা	বুদ্ধদেব
পৃথিবী	হর-গৌরী
পৌর্ণমাসী	প্রভাস-যজ্ঞ
প্রতাপ-মহিষী	আনন্দ রহো
প্রফুল্ল	প্রফুল্ল
প্রবাস	মলিনমালা
প্রবৃত্তি	বুদ্ধদেব
প্রমোদা	শাস্তি কি শান্তি
প্রসূতি	দক্ষ-যজ্ঞ

ফ

ফকিরের মা	ফণির মণি
ফুলধুলা	মায়াতরু
ফুলহাসি	ঐ
ফুলী (কীর্ত্তনওয়ালীর কন্যা)	গৃহলক্ষ্মী

ব

বন্দরা	তপোবল
বনফুল	স্বপ্নের ফুল
বনবিহারিণী	পাঁচকনে
বরুণা	মলিনমালা
বল্লরী	অভিশাপ
বসন্তকুমারী	জনা
বামী ঘট্‌কী	আয়না
বারি	ফণির মণি
বিজয়া	হর-গৌরী

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
বিজরী	চণ্ড
বিন্দু বৈষ্ণবী	মায়াবসান
বিমলা	ফণির মণি
বিম্বাবতী	বাসর
বিরজা (চাতুরী-দীক্ষিতা বন্দীবালা)	নসীরাম
বিরজা (বিধবা)	গৃহলক্ষ্মী
বিরাজ	সপ্তমীতে বিসর্জন
বিরাজের মা	ঐ
বিশাখা	রূপ-সনাতন
,,	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
বিশিষ্টা	শঙ্করাচার্য্য
বিষ্ণুপ্রাণা	নন্দদুলাল
বিষ্ণুপ্রিয়া	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
বৃন্দা	ব্রজবিহার, নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
বেগম (মীরকাসিমের)	মীরকাসিম
বেদ-মাতা	তপোবল
বৈষ্ণবী	সৎনাম
ব্রাহ্মণী	জনা
,,	বাসর

ভ

ভক্তি	চৈতন্য-লীলা
ভদ্রা	শ্রীবৎস-চিন্তা
ভাবিনী	বলিদান
ভীমসেনের রাণী	নল-দময়ন্তী
ভুবন	শাস্তি কি শান্তি
ভৃগু-পত্নী	দক্ষ-যজ্ঞ

ম

মণি (কীর্ত্তনওয়ালী)	গৃহলক্ষ্মী
মণি বেগম	মীরকাসিম
মদনমঞ্জরী	জনা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
মনখরা	স্বপ্নের ফুল
মনহরা	ঐ
মনিয়া (দেলেরার সখি)	মনের মতন
মনোমোহিনী	পাঁচকনে
মন্থরা	রামের বনবাস
মন্দাকিনী	মায়াবসান
মন্দোদরী	সীতাহরণ
মলিনা	মলিনা-বিকাশ
মহামায়া	বুদ্ধদেব
মহেশ্বরী	মলিনা-বিকাশ
মাতঙ্গিনী	বলিদান
,,	পাঁচকনে
মাধুরী	ভ্রান্তি
মাধুলী	নসীরাম
মুঞ্জরা	মুকুল-মুঞ্জরা
মুরলা	কালাপাহাড়
মেনকা	আগমনী, হর-গৌরী
,,	তপোবন

য

যমুনা	আনন্দ রহো
যশোদা	নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
যশোমতী	বলিদান
যুথী	স্বপ্নের ফুল
যোগমায়া	নন্দদুলাল
যোধবাই	ছত্রপতি

র

রঙ্গিনী	মায়াবসান
রতি	জনা, হর-গৌরী, সীতার বিবাহ, বুদ্ধদেব, হীরার ফুল
রমা	শঙ্করাচার্য্য

14—1846B

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
রম্ভা	তপোবন
রাজলক্ষ্মী	বলিদান
রাণী	বাসর, মণি-হরণ
রামী ঘট্‌কী	বলিদান
রামেশ্বরী	আয়না
রুক্মিণী	মণি-হরণ
রেলা	দেলদার
রোশেনা	আবুহোসেন

ল

লক্ষ্মী	ধ্রুব-চরিত্র, হর-গৌরী, শ্রীবৎস-চিন্তা, সীতার বিবাহ
লক্ষ্মীদেবী	চৈতন্য-লীলা
লক্ষ্মীবাই	ছত্রপতি
ললিতা	ব্রজবিহার, নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ
,,	ভ্রান্তি
ললিতের মা	বেল্লিক বাজার
,, পিসী	ঐ
লহনা	কমলে-কামিনী
,,	আনন্দ রহো
লুনা	পূর্ণ চন্দ্র

শ

শচী দেবী	চৈতন্য-লীলা, নিমাই-সন্ন্যাস
শশিকলা	হীরার ফুল
শিউলিনী	শঙ্করাচার্য্য
শিখা	ফণির মণি
শুচিমনি	ছটাকী
শৈবাল	মলিনমালা
শ্রীমতী	অভিশাপ
শ্রীরাধা	ব্রজবিহার, দোল-লীলা, নন্দদুলাল, প্রভাস-যজ্ঞ

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
স	
সইবাই	ছত্রপতি
সঙ্ঘমিত্রা	অশোক
সতী	দক্ষযজ্ঞ
সত্যভামা	প্রভাস-যজ্ঞ
সরমা	সীতাহরণ, রাবণ-বধ
,,	শঙ্করাচার্য্য
সরস্বতী	বিষাদ
,,	বলিদান
সরোজিনী	গৃহলক্ষ্মী
সাগর পত্নী	সীতাহরণ
সানিয়া	মনের মতন
সারী	পূর্ণ চন্দ্র
সাহানা	মোহিনী-প্রতিমা
সীতা	রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস
সুজাতা	বুদ্ধদেব
সুদেষ্ণা	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস
সুনন্দা	নল-দময়ন্তী
সুনীতি	ধ্রুব-চরিত্র
সুনেত্রা	তপোবল
সুন্দরা	পূর্ণ চন্দ্র
সুভদ্রা	পাণ্ডব-গৌরব
সুভদ্রাঙ্গী	অশোক
সুমতি	বাসর
সুমিত্রা	রামের বনবাস
সুরুচি	ধ্রুব-চরিত্র
সুশীলা	কমলে-কামিনী
,,	হারানিধি
সুষমা	অভিশাপ
সূর্পনখা	সীতাহরণ
সোনা	নসীরাম
সোহাগী	বিষাদ
সোহিনী (বৃদ্ধা বারাঙ্গনা)	সৎনাম
স্বপ্ন	নন্দদুলাল
স্বাহা	জনা

চরিত্রের নাম	নাট্যগ্রন্থের নাম
হ	
হরমণি	শাস্তি কি শান্তি
হিরণ	বলিদান
হেমাঙ্গিনী	হারানিধি
হৈমবতী	ঐ

পরিশিষ্ট (খ)

বিষয়ভেদে গিরিশ-নাট্যগ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ

ও

প্রথম অভিনয়ের কাল- ও স্থান-নির্দ্দেশ

পৌরাণিক

		প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
১।	অকালবোধন (গীতিনাট্য)	১৮ই আশ্বিন, ১২৮৪	গ্রেট ন্যাসান্যাল
২।	অভিমন্যু-বধ	১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৮	ন্যাসান্যাল
৩।	অভিশাপ (গীতিনাট্য)	১২ই আশ্বিন, ১৩০৮	ক্লাসিক
৪।	আগমনী (ঐ)	১৪ই আশ্বিন, ১২৮৪	গ্রেট ন্যাসানাল
৫।	জনা	৯ই পৌষ, ১৩০০	মিনার্ভা
৬।	তপোবল	২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮	ঐ
৭।	দক্ষযজ্ঞ	৬ই শ্রাবণ, ১২৯০	ষ্টার
৮।	দোল-লীলা (গীতিনাট্য)	— ফাল্গুন, ১২৮৪	গ্রেট ন্যাসান্যাল
৯।	ধ্রুব-চরিত্র	২৭শে শ্রাবণ, ১২৯০	ষ্টার
১০।	নন্দদুলাল	১লা ভাদ্র, ১৩০৭	মিনার্ভা
১১।	নল-দময়ন্তী	১লা পৌষ, ১২৯০	ষ্টার
১২।	পাণ্ডব-গৌরব	৬ই ফাল্গুন, ১৩০৬	ক্লাসিক
১৩।	পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	১লা মাঘ, ১২৮৯	ন্যাসান্যাল
১৪।	প্রভাস-যজ্ঞ	২১শে বৈশাখ, ১২৯২	ষ্টার
১৫।	প্রহ্লাদ-চরিত্র	৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১	ঐ
১৬।	বৃষকেতু	১৫ই বৈশাখ, ১২৯১	ষ্টার
১৭।	ব্রজ-বিহার (গীতিনাট্য)	— চৈত্র, ১২৮৮	ন্যাসান্যাল
১৮।	মণিহরণ (ঐ)	৭ই শ্রাবণ, ১৩০৭	মিনার্ভা
১৯।	রাবণ-বধ	১৬ই শ্রাবণ, ১২৮৮	ন্যাসান্যাল

পৌরাণিক	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
২০। রামের বনবাস	৩রা বৈশাখ, ১২৮৯	ন্যাশান্যাল
২১। লক্ষ্মণ-বর্জন	১৭ই পৌষ, ১২৮৮	ঐ
২২। শ্রীবৎস-চিন্তা	২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১	ষ্টার
২৩। সীতার বনবাস	২রা আশ্বিন, ১২৮৮	ন্যাশান্যাল
২৪। সীতার বিবাহ	২৮শে ফাল্গুন, ১২৮৮	ঐ
২৫। সীতাহরণ	৭ই শ্রাবণ, ১২৮৯	ঐ
২৬। হর-গৌরী (গীতিনাট্য)	২০শে ফাল্গুন, ১৩১১	মিনার্ভা

ধর্ম্মমূলক

১। কমলে-কামিনী	১৭ই চৈত্র, ১২৯০	ষ্টার
২। করমেতি বাই	৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২	মিনার্ভা
৩। কালাপাহাড়	১১ই আশ্বিন, ১৩০৩	ষ্টার
৪। চৈতন্য-লীলা	১৯শে শ্রাবণ, ১২৯১	ঐ
৫। নসীরাম	১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫	ঐ
৬। নিমাই-সন্ন্যাস	১৬ই মাঘ, ১২৯১	ঐ
৭। পূর্ণচন্দ্র	৫ই চৈত্র, ১২৯৪	এমারেল্ড
৮। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	২০শে আষাঢ়, ১২৯৩	ষ্টার
৯। বিষাদ	২১শে আশ্বিন, ১২৯৫	এমারেল্ড
১০। বুদ্ধদেব-চরিত	৪ঠা আশ্বিন, ১২৯২	ষ্টার
১১। রূপ-সনাতন	৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪	ঐ
১২। শঙ্করাচার্য্য	২রা মাঘ, ১৩১৬	মিনার্ভা

ইতিবৃত্তমূলক

১। অশোক	১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭	মিনার্ভা
২। আনন্দ রহো	৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮	ন্যাসান্যাল
৩। চণ্ড	১১ই শ্রাবণ, ১২৯৭	ষ্টার
৪। ছত্রপতি শিবাজী	৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৪	মিনার্ভা
৫। মীরকাসিম	২রা আষাঢ়, ১৩১৩	ঐ
৬। সৎনাম	১৮ই বৈশাখ, ১৩১১	ক্লাসিক
৭। সিরাজদ্দৌলা	২৪শে ভাদ্র, ১৩১২	মিনার্ভা

		প্রথম অভিনয়	থিয়েটার

সামাজিক

*১।	গৃহলক্ষ্মী	৫ই আশ্বিন, ১৩১৯	মিনার্ভা
২।	প্রফুল্ল	১৬ই বৈশাখ, ১২৯৬	ষ্টার
৩।	বলিদান	২৬শে চৈত্র, ১৩১১	মিনার্ভা
৪।	মায়াবসান	৪ঠা পৌষ, ১৩০৪	ষ্টার
৫।	শাস্তি কি শান্তি	২২শে কার্ত্তিক, ১৩১৫	মিনার্ভা
৬।	হারানিধি	২৪শে ভাদ্র, ১২৯৬	ষ্টার

উপকথা ও কল্পনামূলক

১।	অশ্রুধারা (রূপক)	১৩ই মাঘ, ১৩০৭	ক্লাসিক
২।	আবুহোসেন	১৩ই চৈত্র, ১২৯৯	মিনার্ভা
৩।	আলাদিন	২৮শে চৈত্র, ১২৮৭	ন্যাসান্যাল
৪।	দেলদার (গীতিনাট্য)	২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬	ক্লাসিক
৫।	পারস্য-প্রসূন (গীতিনাট্য)	২৭শে ভাদ্র, ১৩০৪	ষ্টার
৬।	ফণির মণি (গীতিনাট্য)	১১ই পৌষ, ১৩০২	মিনার্ভা
৭।	বাসর (গীতিনাট্য)	১১ই পৌষ, ১৩১২	ঐ
৮।	ভ্রান্তি	৩রা শ্রাবণ, ১৩০৯	ক্লাসিক
৯।	মনের মতন	৭ই বৈশাখ, ১৩০৮	ঐ
১০।	মলিন মালা	১২ই কার্ত্তিক, ১২৮৯	ন্যাসান্যাল
১১।	মলিনা-বিকাশ (গীতিনাট্য)	২৯শে ভাদ্র, ১২৯৭	ষ্টার
১২।	মহাপূজা (রূপক)	১০ই পৌষ, ১২৯৭	ঐ
১৩।	মায়াতরু (গীতিনাট্য)	১৩ই মাঘ, ১২৮৭	ন্যাসান্যাল
১৪।	মুকুল-মুঞ্জরা	২৪শে মাঘ, ১২৯৯	মিনার্ভা
১৫।	মোহিনী-প্রতিমা	২৮শে চৈত্র, ১২৮৭	ন্যাসান্যাল
১৬।	শাস্তি	২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯	ক্লাসিক
১৭।	স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	২রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১	মিনার্ভা
১৮।	হীরক জুবিলী	৭ই আষাঢ়, ১৩০৪	ষ্টার
১৯।	হীরার ফুল (গীতিনাট্য)	১৫ই বৈশাখ, ১২৯১	ঐ

* গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত নাটক ; ইহার শেষাঙ্ক স্বগতঃ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন।

প্রহসন বা ব্যঙ্গনাট্য

	প্রথম অভিনয়	থিয়েটার
১। আয়না	১০ই পৌষ, ১৩০৯	ক্লাসিক
*২। ছটাকী	৮ই পৌষ ১৩১৪	মিনার্ভা
৩। পাঁচকনে	২২শে পৌষ, ১৩০২	ঐ
৪। বড়দিনের বখ্‌সিস্‌	১০ই পৌষ, ১৩০০	ঐ
৫। বেল্লিক বাজার	১০ই পৌষ, ১২৯৩	ষ্টার
৬। ভোটমঙ্গল	২২শে আশ্বিন, ১২৮৯	ন্যাসান্যাল
৭। য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা	১৭ই পৌষ, ১৩১৩	মিনার্ভা
৮। সপ্তমীতে বিসর্জন	২২শে আশ্বিন, ১৩০০	ঐ
৯। সভ্যতার পাণ্ডা	১১ই পৌষ, ১৩০১	ঐ

অনুবাদ

১। ম্যাক্‌বেথ	১৬ই মাঘ, ১২৯৯	মিনার্ভা

* গিরিশচন্দ্রের এই অসমাপ্ত প্রহসনখানি তাঁহার পুত্র শ্রদ্ধেয় নটশ্রেষ্ঠ ৺ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে আমি সমাপ্ত করিয়াছিলাম।

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত বা সম্পাদিত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

১। **বাঙ্গালা বচনাভিধান**—(সঙ্কলিত) রয়্যাল ১৬ পেজী, ২১৬+৮ পৃষ্ঠা, ১৯৫০। মূল্য ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা।

বহুবিধ বাঙ্গালা রচনা হইতে বহু রকমের সূক্তি (সুভাষিত) সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সেগুলিকে বিষয় হিসাবে সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। **বাঙ্গালীর পূজাপার্ব্বণ**—(সম্পাদিত) ডিমাই ৮ পেজী, ১০৪ পৃষ্ঠা, ১৯৫০। মূল্য ৪৲ চার টাকা। এ ধরনের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত।

ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি স্বর্গত মনীষিগণের লেখনীপ্রসূত ২৬টী বিলুপ্তপ্রায় প্রবন্ধ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ভাষার সৌরভে ও ভাবের গৌরবে প্রত্যেক প্রবন্ধই সমুজ্জ্বল। 'সম্পাদকের বক্তব্যে' গ্রন্থ-সম্পাদক ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা ও সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

৩। **শাক্ত পদাবলী** [পঞ্চম সংস্করণ]—(সম্পাদিত) ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজী, ২৩৫+৩২ পৃষ্ঠা, ১৯৫৫। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

শাক্ত সঙ্গীতসমূহের অভিনব সঙ্কলন। ইহাতে শতাধিক কবি ও সাধকের রচিত তিন্ শতাধিক সুনির্ব্বাচিত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শাক্ত সঙ্গীতকে ভাব-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সাজাইবার চেষ্টা এই প্রথম। ইহার 'ভূমিকা' যেমন সুখপাঠ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ। বি.এ. পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকরূপে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কয়েকখানি নূতন বাংলা গ্রন্থ

১। জ্ঞান ও কর্ম্ম (শতাব্দী সংস্করণ)--আচার্য্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়্যাল ৮ পেজী, ৩০৯ পৃষ্ঠা, ১৯৫৫। মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

২। সমালোচনা-সংগ্রহ (৪র্থ সংস্করণ)—ডিমাই ৮ পেজী, ২৯৯ পৃষ্ঠা; ১৯৫৫। মূল্য ৪৲ চার টাকা।

৩। পদাবলী-সাহিত্য (লীলা বক্তৃতা)---কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। রয়্যাল ৮ পেজী, ১৭৪ পৃষ্ঠা, ১৯৫৫। মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

৪। জ্ঞানদাসের পদাবলী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য ১০৲ দশ টাকা।

৫। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)—শ্রীতারকনাথ রায়। রয়্যাল ৮ পেজী, ৩২৯ পৃষ্ঠা, ১৩৬২। মূল্য ৯৲ নয় টাকা।

৬। নিরুক্ত, (প্রথম খণ্ড) [আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং ৫]—ডক্টর শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর, এম্.এ., পি.এইচ.ডি., কর্ত্তৃক অনূদিত। রয়্যাল ৮ পেজী, ৩৪৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮৲ আট টাকা।